জীবন সঙ্গিনী =

রাখালচন্দ্র দাস

প্রভা প্রকাশনী

পরিবেশক :—প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৬৩

মুদ্রণ ঃ
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশ স্বাধীন হয়েছে একুশ বছর হল। ইংরেজ চলে গেছে ভারতবর্ষ ছেড়ে। কিন্তু চক্রান্ত করে, বিভক্ত করে গেল এ উপমহাদেশকে। ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হল। শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফলস্বরূপ হাজার হাজার উদ্বাস্তু পাকিস্তানের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতেব বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল।

ধন-প্রাণ-মান-ইজ্জত রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল। অতএব পিতা-পুত্র পরামর্শ করে ঠিক করলেন—এদেশ ত্যাগ করতে হবে। পিতা রয়ে গেলেন মাতৃভূমি রক্ষার্থে। আর পুত্রদের পাঠিয়ে দিলেন ভারতে। কিছু অর্থের বিনিময়ে সীমানা পারাপারে কোন অসুবিধা হল না।

মহিতোষ ছোট ভাই উৎপলকে সঙ্গে নিয়ে কোলকাতার অদূরে আশ্রয় নিল। মহিতোষ সঙ্গে এনেছিল বেশ কিছু টাকা। এ টাকা দিয়ে একটা দোকান খুলল।

দোকানটি কিছুদিনের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠল--তার মূলে সততা ও দু'ভাই-এব কঠোর পরিশ্রম। স্বভাবে মহিতোষ এবং উৎপল বেশ শান্ত মিশুকে। অল্পদিনের মধ্যে নতুন পরিবেশকে আপন করে নিল। মহিতোষ স্থানীয় ক্লাবের সদস্য হল।

বন্ধুমহলে তার নাম ছড়িলে পড়ল। বন্ধুরা তাকে সর্বদিক থেকে সাহায্য করল। দোকানে খরিদ্দার বাড়ল।

উৎপল স্থানীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হল। সে স্কুলে যায় আর মহিতোষ দোকানদারি করে। এভাবে ওদের দিন কাটছিল।

মহিতোষেরা আসার পূর্বে বকুলের শাশুড়ী ও দেবর বাসা ভাড়া করে থাকত। মহিতোষেরা দু'ভাই প্রথমে এ বাসাতেই উঠল।

সেদিন অরুন্ধতি দেবী খুব খুশী হয়েছিলেন! তিনি ওদের রান্নার ভার নিজের হাতে নিলেন।

উৎপল স্কুল থেকে ফিরে এসে দোকানে যায়। দোকানে দাদার কাছে সাহায্য করে। সন্ধ্যার পর বাড়ী এসে পড়াশুনা করে। আবার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দোকানে যায়। মহিতোষ বাজার করে দেয়। উৎপল সেই বাজার নিয়ে বাড়ি আসে। তারপর অরুন্ধতি রান্নার কাজে লেগে যান। রান্না হতে হতে উৎপল নিজের পড়াশুনা সেরে নেয়। এমনি চলছিল ওদের প্রত্যাহিক জীবনযাত্রা।

স্কুল থেকে ফিরে উৎপল খেয়ে নেয়। তারপর মামীমার সঙ্গে লুড়ো খেলতে বসে। সব দিন সম্ভব হয় না! যে দিন স্কুল থেকে আগে আসে সেদিন সম্ভব হলে খেলে নয়তো দোকানে যায়। কিন্তু রবিবার বা স্কুল বন্ধের দিন খেলার সুযোগ পায়। সেদিন খেলে। মহিতোষও খেলার সুযোগ পেলে খেলে।

অরুন্ধতি দেবীর নাতি নাতনীরা কাছে নেই। সুতরাং বেয়ান মশায়ের ছেলে দুটোকে কাছে পেয়ে তিনিও খুব খুশি। তিনি ধর্মপ্রাণা মহিলা।

মাকালীর ভক্ত। মহিতোষ খেলতে বসে মামীমাকে রাগাবার চেষ্টা করে। অরুন্ধতি দেবী খেলায় হেরে গেলে বলে মাকালী, একটা ছক্কা ; ছক্কা পেলে পাঁঠা বলি দেব।

অরুন্ধতি দেবী হাসেন।

এভাবে কিছুদিন ভালই কাটল।

তিন চার মাস পর উমেশ ভিলাই থেকে লিলুয়াতে বদলি হয়ে আসে এবং মাকে নিজের কাজে নিয়ে এল।

মামীমা চলে যাওয়াতে মহিতোষেরা দোকানেই খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা করল। সুতরাং উৎপলের কাজ বেড়ে গেল। নিরিবিলি পড়াশুনারও সুযোগ থাকল না। মহিতোষেরও কাজ বেড়ে গেল। পুঁজি কম। সুতরাং সপ্তাহে দুদিন মাল আনতে কোলকাতা যেতে হয়। খদ্দেরের চাহিদা পূরণ করতে হলে এভাবে অধিক খাটতে হচ্ছে। দোকানদারির ফাঁকে রান্না, বাজার হাট সবই দেখতে হয়। উৎপলকেও দাদার পাশাপাশি সব কাজে সাহায্য করতে হচ্ছে।

দাদা সকালে রান্না করে।

ভাই দোকান পাহারা দিতে দিতে পড়াশুনা করে। খদ্দের এলে মহিতোষ এগিয়ে আসে। উৎপল রান্নার দিকটা দেখে। এক সময় রান্না হয়ে যায়। উৎপল স্নানাহার করে স্কুলে যায়। সন্ধ্যার পরে আবার রান্না করতে হয়। তখন ভাই সামনে বসে পড়ে এবং খদ্দের দেখে। এভাবে দু'ভাই মিলে মিশে সব দিক ঠিক রাখার চেষ্টা করে। ঠিক রাখার চেষ্টা করলেও সব ঠিক থাকে না। মহিতোষের বন্ধুরা এসে দোকানে গল্প-গুজব করে। তাছাড়া নানা ধরনের লোকের প্রয়োজন মেটানো এবং তাদের কথাবার্তায় দোকানে পড়িবার পরিবেশ নষ্ট হয়। সুতরাং উৎপলের পড়াশুনা ঠিক ঠিক হয় না। ক্লাসের পড়াশুনায় উৎপল তাল দিয়ে উঠতে পারল না। তাছাড়া বৎসরের মাঝামাঝি ভর্তি হওয়াতে উৎপল পড়াশুনায় অনেক পিছিয়ে পড়ল। ফলে বার্ষিক পরীক্ষায় উৎপল ফেল করল। ফলে নবম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণীতে প্রমোশন পেল না।

এদিকে উমেশের বিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং মহেশবাবু স্ত্রী ও কন্যাকে মা ও ভাইয়ের কাছে নিয়ে এলেন। সম্বন্ধ জুটে গেলে ভাইকে বিয়ে দিয়ে তিনি আবার ফিরে যাবেন। মহেশবাবু স্কুল শিক্ষক। হাতে যে সময় নিয়ে এলে তার মধ্যে এদিকের কাজ সারতে পারলেন না। সুতরাং আবার দেশে ফিরতে হয়। ফেরার সময় মাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, কেননা অরুন্ধতি দেবী দেশে ফেরার জন্য উতলা হয়ে পড়লেন।

কিছুদিন পর মহিতোষ, উমেশের সঙ্গে পরামর্শ করল যে; উমেশ মাসিক খরচা দিয়ে আত্মীয়দের সংসারে খাওয়ার ব্যবস্থা করুন আর বকুল তার কাছেই থাকুক। উমেশ এ প্রস্তাবে রাজি হল। মহিতোষবা যে বাড়ীতে প্রথমে উঠল সে বাড়ীতেই একটা ঘর ভাড়া করল। বোনকে কাছে এনে মহিতোষ হাফ ছেড়ে বাঁচল। দোকানের স্বল্প পরিসরে থাকা খাওয়া খুবই কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দিদি আসাতে উৎপলের আর আনন্দ ধরে না।

বাড়িতে বসে নিরিবিলি পড়ার সুযোগ পেল। দাদা রাশভারি লোক। দাদার সঙ্গে মনের কোন কথা খুলেও বলতে পারত না। মা-বাবার জন্য দেশের জন্য প্রায়ই মন খারাপ করত। কিন্তু দাদা কোন দিনই তার মনের কথা জানতে চাইত না। বলতে গেলে দোকানের কোলাহলে এবং দম আটকানো পরিবেশে উৎপল তার শৈশবের সুকুমারমতি আচরণগুলো ভুলতেই বসেছিল।

একদিন বকুল রান্না করছিল। উৎপল এসে পাশে বসল। বলল।

—দিদি একটা গল্প করব ?

—তোর পড়া হয়ে গেছে বুঝি ! তবে একটা গল্প বল।

—শোন দিদি, আমার গল্প রাজপুরী নিয়ে নয়। এ অভাগা উৎপলকে নিয়েই।

—সে কি কথা রে !

—হ্যাঁ দিদি। একদিন না, তরকারিতে নুন দিইনি। মোদ্দা কথা, বিহারী ঠাকুরকেও হার মানায়। তা বুঝলি, দাদা আমাকে এজন্য খুব বকল—রান্না করতে পারিস না তো চাষ কর গিয়ে। এই যা ! আর একদিন লঙ্কাই দিইনি।

—সে কিরে উৎপল !

তুই নাকি খুব ভাল রাধতে পারিস। বাবা তোর তারিফ করেছিল রে।

দিদির কথা শেষ হতে না হতেই ভাই ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

—হ্যাঁ ভাল রাধতে পারিত। তুই পোড়ারমুখী সব কথায় বাধা দিস। নুন-লঙ্কা না দিলে বুঝি ভাল রান্না হয় না ?

হ্যাঁ, খুব হয়। তারপর নতুন কথা বল দেখি।

—সাইকেল চালাতে খুব সখ ছিল রে দিদি—বন্ধুরা চালাতো। কিন্তু দাদা কোথাও যেতে দিত না। মাঝে মাঝে রাগ হত ; দাদা যেন কি !

এ ছেলে বয়সে অন্য ছেলেরা কেমন দুরন্তপনা করে, ছোটাছুটি, খোলা হাওয়ায় খেলাধুলা করে বড় হচ্ছে। আর আমাকে বুড়োর মত

সারা দিনরাত জুবু থুবু হয়ে পড়ে থাকতে হয়। একি সহ্য হয়!

—হু! হয়তো তোর কপালে এমনই ছিল।

--তা আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। একদিন স্টোভের উপর হাঁড়ি চাপিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে সাইকেল শিখতে গেলাম। এ দিকে সব ভাত পুড়ে ছাই হল।

—ইস্, তারপর?

তারপর আর কি, যা হবার তাই হল।

দাদা আমায় বেশ করে উত্তম মধ্যম লাগাল।

বকুল ছোট ভাইয়ের কথাগুলো শুনতে শুনতে ভারাক্রান্ত হল। তার চোখ বেয়ে জল পড়ছিল। উৎপল শুধু বকেই যাচ্ছিল। অন্যদিকে তার খেয়াল নেই। এমন সময় মলি এসে উৎপলের হাত আকর্ষণ করল–চল মামু আমরা খেলা করি। উৎপল উঠে গেলে বকুল মনে মনে ভাবল—ছেলেমানুষ বিকেল বেলা একটু না খেলতে পারলে হয়!

সেদিন ছিল রবিবার।

মহিতোষ ভৎসনার সুরে বল্লেন—নাও বসে থাকলে তো চলবে না। গিয়ে দোকান খুলে বস।

দোকান খোলার সময় হয়নি এখনও। তবু দাদা কেন তাকে দোকানে পাঠাচ্ছেন, আর নিজে ইজিচেয়ারে বসে হাওয়া খাচ্ছেন? উৎপল কিছু না বুঝে একটু বিরক্ত হয়েই উঠে পড়ল। মুখে কোন প্রতিবাদ করতে পারল না।

ছোটবেলা থেকে মহিতোষ রুক্ষ মেজাজের লোক। যত মেজাজ বাড়ীতেই। বড় বলে কিছুটা আত্ম গরিমাও কাজ করে। বাইরে গেলে ঠিক মিলে মিশে চলে। মহিতোষ বকা ঝকার মধ্যে তার বড়ত্ব প্রমাণ করতে চায়।

বকুলকে ছোটবেলা থেকেই বকা ঝকা করে আসছে। এখনও সে অভ্যাস যায়নি। বোন ভাল কাজ করলেও তার মন উঠে না। নাক সিটকানি, হাত নাড়া ও মুখভঙ্গি দিয়েই তা প্রকাশ করে।

বকুল রাগ করে না।

কারণ সে জানে মহিতোষ ঐ ধরণেরই লোক পান থেকে চুন খসলে আর রক্ষা নেই।

মামী মা কতদিন গল্প করেছেন—

একদিন উৎপলের পাত থেকে শুকনো ভাত মহিতোষের পাতে লাফিয়ে পড়ল, মহিতোষ তখনই ভাইকে লাথি মারল।

"মহিতোষের দরদটাই ওরকম।"

আর একদিনের কথা। বকুল ভাত দিতে গিয়ে আসন পেতে দিল, মহিতোষ খেতে বসল। ভাত সুমুখে দিতে না দিতেই সারা ঘরে ভাত ছড়িয়ে ফেলল—খেতে বসেছি হাত ধোয়ার জল নেই; না আর খাব না।

মহিতোষ উঠে গেল। বকুল চোখের জল ঝরাল আর মনে মনে বলল -বিয়ের পর বৌদি ভাত দিয়ে গল্প করতে চলে যেত, তখন অন্যায় হত না; এখন আমার বেলায় এত কাণ্ড!

অহেতুক কারণেও মহিতোষ বাড়াবাড়ি করে। বকুল বোঝে দাদার অসুবিধেটা কোথায়?

প্রথমতঃ নিজেদের প্রয়োজনেই কোন ভাগ্নীর ভরণপোষণ করতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ মহিতোষ নববিবাহিত। আসার সময় স্ত্রীকে সঙ্গে আনল না কেননা সুরমা অন্তসত্বা।

এভাবে একটা বছর কাটল।

তারপর একদিন মহিতোষ জানতে পারল, ওর মেয়ে হয়েছে। সেও তো প্রায় এক বছর হতে চলল। ইতোমধ্যে দু'বছর অতীত হতে চলল। এখন তার দোকানের অবস্থাও ভাল। তার ইচ্ছা বৌকে নিজের কাছে নিয়ে আসে।

কিন্তু বাদ সাধলেন বুড়োটা-- বিদেশের বাড়ী পাছে ছেলে—বৌ না খেয়ে মরে তাই এত সাবধান। কিন্তু মহিতোষ আর ধৈর্য ধরতে পারে না। তাই তার এত রাগ। আর এ রাগ নির্দোষ ভাইবোনের উপর

বর্ষিত হয়।

কয়েকদিন ধরে মহিতোষের বাঁকা বাঁকা কথায় উৎপল-বকুল অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ওরা সতর্ক হয়ে চলত। তবু বকা খেত। বকুল কাঁদত। কাঁদত নিজের জন্য। কাঁদত উৎপলের জন্য। তবু শান্তি পেত না।

একটি বছর অতীত হইল।

শ্বশুর-শাশুড়ী কাছে নেই। তাদের আসার সম্ভাবনাও কম। স্বামীই নারীর গতি। তিনিও কাছে নেই। বকুল নিজের দুঃখে কাঁদত। বিধির বিপাকে বকুলের চেয়েও বেশী কষ্টে আছে কত উদ্বাস্তু। তারা ফুটপাথে কিংবা খালপাড়ে কোন রকমে মাথা গুজে পড়ে আছে।

উৎপলের বয়স পনের।

আহা! মায়ের আদুরে ছেলে। দাদার অনাদর বকুল সইতে পারে না! দু' বছর হয় সেও মা-বাবাকে দেখছে না। উৎপল দিদির স্নেহ যত্ন পেয়ে মা-বাবার থেকে দূরে থাকার দুঃখ অনেকটা ভুলতে পারল।

একদিন দিদিকে কাঁদতে দেখে বলল।

—ছি! অমন করে কাঁদতে নেইরে দিদি।

তুই কাঁদলে আমার খারাপ লাগে।

দিদি তবু কাঁদে। অবুঝ মন। উৎপল তাই দিদিকে সান্ত্বনা দেয়— বুঝলি দিদি আমাদের এখন বেশ আয় হচ্ছে। আমরা হঠাৎ বড়লোক হব। তারপর আমরা বাড়ি করব। তখন মা-বাবা সবাই আমাদের কাছে চলে আসবে।

প্রতি দুঃখের মধ্যেও বকুলের মুখে হাসি ফুটল। বকুল বুঝল এ অবুঝ ছেলের মনে কত স্বপ্ন!

কিন্তু উৎপল থামতে চাইল না।

সে আরো বলল— দেখবি দিদি এবার দাদাবাবু আসবেন। মাইরি বলছি তুই দেখিস।

—ওরে মুখপোড়া অমন করে বকচিস কেন? তোর দাদাবাবু আসবে কিনা আসবে তাতে আমার কি! ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

—বেশ তো আমার কেউ নেই, তুই ঢালপালা নিয়ে সুখে থাক। আসুক দাদাবাবু বলছি।

—তবেরে মুখপোড়া···

দিদি হাতের কাছে ছড়িটা কুড়িয়ে নিতেই উৎপল তিড়িং তিড়িং করে গিয়ে জলে পড়ল। স্নান করল। খাওয়া-দাওয়া সেরে স্কুলে গেল। এরকম মাঝে মাঝে দিদি, ভাইকে কৃত্তিম রাগ দেখায়।

সেদিন দুপুরবেলা বকুল খেতে বসলে মহিতোষ তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল—বিয়ে হয়েছে প্রায় তিন বছর হল। বুড়োটা কি! যেন কিছু বোঝে না। ওদের নিয়ে আসে ভাল, নয়তো আমার অন্য চিন্তা করতে হচ্ছে।

তারপর মহিতোষ স্নান করতে গেল।

বকুল বোঝে।

—দাদা কত কষ্ট পাচ্ছে!

কিন্তু তার কিইবা করার আছে। এক মলির বাবা কাছে থাকলে তার দিক দিয়ে বাবাকে বলাতে পারতো। সেও তো এখন কাছে নেই।

কি করবে বকুল? উৎপলকে বলবে?

ওতো সব ব্যাপারে মজা করে বেড়ায়। সংসার কি জিনিস ছাই বোঝে! লেখাপড়া জানা নেই। না হয় মলির বাবাকে নিজেই লিখে জানাত। অন্যের দিক দিয়ে এসব লেখানো যায়! দাদার মনের কথা আঁচ করা যায় কিন্তু বলা যায় কি করে অন্যের কাছে? এ ভারি লজ্জার কথা।

বকুল চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বিকেল বেলা উৎপল স্কুল থেকে ফিরে এল। খেতে বসল। লক্ষ্য করল দিদি অন্যদিনের মত স্বাভাবিক নয়। কি একটা ভাবছে। কপালে তার চিন্তারেখা।

চোখে মুখে তার উদ্বিগ্ন ভাব।

—কি হয়েছে রে দিদি? আমার সঙ্গে আড়ি পাতসি?

—আড়ি পাতব কেন ভাই!

মা-বাবার কথা ভাবছি। তোর কি ! গোকুলের ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়াস। কোন খোঁজ-খবর তো রাখিস না।

—বা ? বেশতো, আমি না হয় গোকুলের ষাঁড়।

তুই বুঝি বৃন্দাবনের রাধা।

বকুল ঝংকার দিয়ে উঠল।

—ভাই তুই মাত্রা জ্ঞান হারাচ্ছিস।

উৎপল বুঝি লজ্জা পেল। মাথা নীচু করে বলল।

—তুই অমন করে ভাবিস কেন বলতো ? এই তো সেদিন বাবাকে চিঠি দিলাম।

উঃ !

কিরে ! কাঁটা বিঁধেছে বুঝি !

বকুল উদ্বিগ্ন হল।

—মাইরি দিদি বলতে ভুলে গেছি।

দিদি আস্বস্ত হল।

- কি ভুলেছিস ?

— সেদিন একটা চিঠি এসেছিল। তোকে পড়ে শোনাইনি। বাবার চিঠি।

- যাক্‌গে কি লিখেছে বল ?

আমায় লিখেছে।

—বাবা উৎপল, মন দিয়ে পড়াশুনা করো, হেলায় সময় নষ্ট করো না। ইত্যাদি···

তোকে লিখলেন।

—মামণি উৎপল ও মহিতোষেব প্রতি যত্ন নিস। আমাদের জন্য ভাবিস নে। ইত্যাদি···

মলিকে লিখলেন।

—দিদিভাই তুমি কেমন আছো ?

তোমার কথা সব সময় মনে পড়ে। তোমার বাবা কিছুদিনের মধ্যে তোমার কাছে যাবেন। শেষের কথায় বকুল চমকে উঠল।

—অ্যা ! কি বল্লিরে উৎপল, 'মলি'র বাবা আসবেন ?

—আমি কি জানি ছাই ?

মলির বাবা আসবে কি না আসবে, তাতে আমার কি ?

—তুই সব সময় ইয়ারকি করিস তাই তোকে ভাল লাগে না।

উৎপল চোখ দুটো বড় বড় করে মাথা নেড়ে বলল

—ওদিন যে বললি দাদাবাবু আসুক আর না আসুক তাতে তোর কিছু আসে যায় না। আজ মলির বাবার কথা জিজ্ঞেস করিস কেন ?

—তুই একটা আস্ত গরু বুঝলি !

দেখছিস না মলি এক একদিন ধরে ওর বাবার জন্য কেঁদেছে।

দিদিকে হাসি খুশি দেখে উৎপল পুরানো কথা তুলল।

—কৈ দিদি কি একটা খবর রাখি না বললি ?

—শোন আজ দুপুরে দাদা বল্ল, বাবা বৌদিকে না নিয়ে এলে দাদা আর এক বিয়ে করবে।

—বেশ ত ! আমি বাবাকে একথা জানিয়ে দেব।

—বিপদ !

তোকে বলা আর এক বিপদ। দাদা কি আর ওভাবে বলেছে ! এসব কথা বুঝে নিতে হয়।

তুই কি করে বুঝলি ?

—সব কথা ছোটদের বুঝতে নেই।

যা বলছি শোন, বাবাকে লিখ বৌদিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে। সুনীতিকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

—বুঝলাম বাবা বুঝলাম।

দাদাবাবুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে বলবো ?

—আবার ফাজলামি করছিস ?

এমনি রঙ্গ রসিকতার মধ্যে দিনটি কাটল। সেদিন ছিল শুক্লাপক্ষের একাদশী। রাত দশটা। মহিতোষ ঘরের বারান্দায় বসল। জ্যোৎস্না ভরা রাত। আকাশের তারাগুলো মিট মিট করে জ্বলছে। নিস্তব্ধতা নেমে এল চারদিকে।

জ্যোৎস্না মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। মনে হয় কোন মায়াবিনী তার মায়াজাল বিস্তার করে রেখেছেন। অনতি দূরের গাছপালাকে মায়াবিনী তার যাদুবলে পাথর করে দিয়েছে। হাওয়া উধাও। গাছপালা নড়ে না। সবাই ধ্যানস্ত। যেখানে গাছপালা নেই—ধূ-ধূ মাঠ। সেখানে যেন দেবতাদের রুপোর সিঁড়ি বাধা আছে।

দেবতারা আসেন।

জ্যোৎস্নায় অবগাহন করতে পৃথিবীর বুকে।

চন্দ্র যেন শুভ্র গোলক পিণ্ড।

এ-চাঁদেই কিনা কলঙ্ক রয়েছে!

মহিতোষ একদৃষ্টিতে চাঁদ নীরিক্ষণ করছিল আর ভাবছিল কত কী! ভাবছিল স্ত্রী সুরমা ও কন্যা সুনীতির কথা!

নয় দশ মাসের মেয়ে নাজানি কত সুন্দর!

কল্পনায় যেন দেখল সুনীতি তার দিকে ছুটে আসছে। আর সে ডাকছে বাবা! বাবা!

ফুট ফুটে মেয়ে হাসছে কত! মেয়ের ডাক! মহিতোষের চিন্তা ভাবনা অজ্ঞাতসারে ধ্বনি হয়ে উঠল। মেয়ের আহ্বান। শোনা গেল দূর থেকে।

খেতে বসলে বকুল জিজ্ঞেস করে।

- বাবা কবে আসবেন, দাদা?

মহিতোষ রাগ করেই বলে।

—বাবা তোদের কথা ভুলে গেছে।

দাদার কঠিন কথায় বকুল ইতস্ততঃ করতে লাগল।

- তুমিই তো একটু আগেই বাবার কথা বল্‌লে।

তাই তো বলছি।

মহিতোষ হঠাৎ থেমে গেল।

কি বলতে যাচ্ছিল, তা আর বলা হল না। কিছুক্ষণ আগের কথাগুলো তার মাথায় কিলবিল করে ছবির মত সচ্ছ হয়ে উঠল। বুঝতে পারল নিজের ভুল। লজ্জিত হল। নিজের মন থেকেই কৈফিয়তটা

ফুটে উঠল।

—ও কিছু না বকুল।

উঠতে বসতে গুরুজনদের স্মরণ নিতে হয় বৈকি?

বকুল দাদার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় কতটুকু সন্তুষ্ট হল বলা কঠিন। তবে সে চুপ করল। পরদিন বাড়িউলি বাসা ভাড়ার টাকা নিতে এলে জিজ্ঞেস করল।

— বৌ কবে আসবে মহিতোষ?

—কিছু দিনের মধ্যে বাবা নিয়ে আসবেন, মামী।

মামী টাকা পেয়েই খুশি।

বৌ-মার কথা শুনে হাসিমুখে উপরে চলে গেলেন।

মহিতোষরা আসার কিছুদিন পর মহেন্দ্রবাবু এসেছিলেন। তিনি ছেলেদের ব্যবসার হালচাল দেখে গেলেন। তারপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

যাবার সময় কথা দিয়ে ছিলেন বৌমাকে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। কেননা তিনি বাড়ি পৌঁছে জানতে পারলেন সুরমা আসন্ন প্রসবা।

কিছুদিন পর সুরমা কন্যাসন্তান প্রসব করল। অতএব নাতনি বড় না হওয়া পর্যন্ত সুরমাকে দেশে থাকতে হল।

কন্যা সুনীতির অন্নপ্রাসন হল। মহিতোষ চিঠিতে জানল কিন্তু দেখতে পেল না।

এদিকে উমেশের তখনও বিয়ে হয়নি। ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে মহেশবাবু স্ত্রী-কন্যাকে তড়িঘড়ি করে নিয়ে এলেন। তখন অরুন্ধতি দেবী দেশে ফিরলেন। তারও কিছুদিন পর উমেশের বাবাও এলেন। তিনি এলেন ছেলের বিয়ে দিতে।

যথাসময়ে উমেশের বিয়েও হল।

বিয়ের কিছুদিন বকুলকে দেওরের কাছে থাকতে হল। সে সময় মহিতোষরা দীনেশদার সংসারে খাওয়া দাওয়া করত।

দীনেশবাবু উমেশের মাসতুতো দাদা।

মহিতোষদের পাশেই থাকত। বকুলের অনুপস্থিতিতে তারা উৎপল-মহিতোষের রান্নার ভার নিল। দেওরের বিয়ের পর বকুল ফিরে এল।

উৎপলের তখন নবম শ্রেণীতে বার্ষীক পরীক্ষার সময়। দিদি আসাতে উৎপলের পড়ার সময় সুযোগ বাড়ল। মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিল। পাশও করল। নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে প্রমোশন পেল।

উমেশের বিয়ের পর মহেশ ভ্রাতৃবধূকে আশীর্বাদ করতে এলেন। আসার সময় সুরমাও তার কন্যা সুনীতিকে নিয়ে এলেন। মহেন্দ্রবাবুও জামাতাবাবুর সঙ্গে পুত্রবধূকে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেশবাবু নববিবাহিতা ভ্রাতৃবধূকে আশীর্বাদ করলেন। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়ালেন। তারপর একটা বাড়ি কেনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পরিবারের লোকজন রয়েছে —তার উপর উমেশ বিয়ে করেছে। সুতরাং একটা বাড়ির প্রয়োজন। কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে তাকে দেশে ফিরতে হল। যাবার সময় তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে মহিতোষের কাছেই রেখে গেলেন।

নিশ্চিন্ত মনেই দেশে ফিরলেন।

প্রথম দিকে সুরমা বকুলের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করল। তারপর যতই দিন যেতে লাগল ততই ঠাকুরঝির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

কারণটা এরকম — সুরমা মনে করত বকুলরা তাদের সংসারে আগাছার মত রয়েছে। তাছাড়া বকুলের জন্য সুরমার অসুবিধে হত। কেননা বকুল গৃহবধূর স্বেচ্ছাচারিতা পছন্দ করত না। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে শুধরিয়ে দিত।

বকুলের তদারকি করাটা সুরমার ভাল লাগত না। তাছাড়া সুরমা গৃহের কর্ত্রী। দেশের বাড়িতে শাশুড়ী মাতার জন্য কাজে ফাঁকি দেবার তো ছিল না

কিন্তু এখানে তা হবে কেন ? তার স্বাধীনতায় বকুল হাত দেবে কেন ? বকুল এখানে অতিথি। সে অতিথির মতই থাকবে। সব ব্যাপারে নাক গলাবে কেন ? কিন্তু বকুল দাদার সংসারের কোন ক্ষতি হোক তা সে সইতে পারে না। ফলে বৌদি-ননদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক ক্রমেই শিথিল হতে লাগল।

বকুল চাইত সংসারে তুটো কথা না বাড়ুক। প্রতিবেশির সঙ্গে মিলে মিশে চলাই তার নীতি। সুরমাও যে মিলে মিশে চলতে চাইত না তা নয়। কিন্তু সর্বত্রই সে নিজের সম্বন্ধে বড়াই করে চলত। সুরমার এই নিরস বড়াই করা কথাবার্তা প্রতিবেশিনীদের কেমন লাগত।

বকুল পড়ল বিপদে।

দাদার কাছেও কোন কথা বলতে পারত না। অথচ বৌদি মাঝে মাঝে এমন ব্যবহার করত—যা অসহ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। বকুল শান্তশিষ্ট তাই সহ্য করে থাকত। অন্যদিকে সুরমা নিজের অহংকারেই গদ গদ হয়ে থাকত।

কথার বেলায় লম্বা লম্বা, কাজের বেলায়—রম্ভা।

সুরমা নিজেকে অপরের কাছে বড় বলে জাহির করতে চাইত। কিন্তু বড় যে কি ভাবে হওয়া যায় তার কোন বাস্তব জ্ঞান ছিল না। নিজের অহংকারে শুভ্রতাকে বড় বলে ভাবত।

অপরদিকে বকুল বিনয়, সরলতা, মাধুর্যও খোলাখুলি কথাবার্তার জন্যই অন্য মেয়েদের কাছে এত প্রিয় হল। সুরমার কাছে বকুলের এই জনপ্রিয়তা অসহ্য ছিল। অন্য মেয়েদের কাছে লাগানি-ভাঙ্গানি দিত, কিন্তু তারা সুরমাকে জানত বলে চুপ করে থাকত।

সুরমা সুযোগ পেলেই বকুলকে থাকা-খাওয়ার খোট্টা দিত। এজন্য অন্য মেয়েরা পাঁচ কথা তুলল।

—সুরমা কেমন যেন !

অপরের সঙ্গে ভাব করে চলে না। বড়-ছোট মানে না। দেবর-ননদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না।

সুরমা এসব কথায় কান দিত না।

মতিতোষ শুধু যে বাজারের সেরা তরি তরকারি কিনত তা নয়। বাজারের সেরা ফলমুল কেনার প্রতিও তার নজর ছিল। প্রায় দিনই একটা কিছু নিয়ে বাড়ি ঢুকত। বাজার করার দিক দিয়ে বন্ধু মহলে তার খুব প্রশংসা ছিল।

যেমন আয় করত তেমনি ব্যয় করত। কিন্তু সুরমা পাকা গিন্নী নয়। সে যেমনি অপব্যয় করত তেমনি বেহিসাবি ছিল। বাজার বাড়িতে এলেই সুরমা সবটা নিয়ে রান্নার জন্য তোড়-জোড় করত।

বাধা দিত বকুল।

অল্পের মধ্যেই গুছিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করত। দেখে দেখে জ্যান্ত মাছগুলো জিইয়ে রাখত। পরদিনের জন্য প্রয়োজনাধিক তরকারি সঞ্চয় করত।

পূর্বেই বলেছি মহিতোষদের পাশের ঘরে তার মাসতুতো দাদারা থাকত। ওরা দু'ভাই। বিয়ে করেছে দুজনেই। বড় জায়ের নাম— রীণা, ছোট জায়ের নাম বীনা। নরেশ বড়, দীনেশ ছোট। নরেশ মাইনে পেত কম। দীনেশ পেত বেশী। বীনা দিনেশের সোহাগে গরবিনী। নরেশের দু'ছেলে আর দীনেশের এক মেয়ে। বীনার হিংসা হত ভাসুরের মাইনে কম অথচ সংসারের খরচ বেশী।

বীনা এজন্য অকারণেও রীনার সঙ্গে ঝগড়া করত। কারণ একটা অজুহাতে না হলে তো পৃথক হওয়া যাবে না।

দীনেশ ডকে কাজ করত।

মাঝে মাঝে ডকে থাকতে হত। ওভারটাইম করে পয়সা পেত প্রচুর। তারপর বাড়ি ফিরত। পথে প্রিয়ার কথা ভাবত। মনে তার পুলক জাগত এই ভেবে হয়তো প্রিয়া তার জন্য ফুলশয্যা করে রেখেছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখত কণ্ঠক শয্যা।

কারণ বীনা হাড়ি-মুখ করে বসে আছে অথবা অভুক্তা। রীনার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে তারই নিদর্শন স্বরূপ এ উপবাস। নতুবা স্বামীর মন গলবে কেন?

দীনেশ সাহস করে দাদা বৌদিকে কিছু বলত না। কিন্তু প্রিয়ার

অবস্থা দেখে প্রাণে খুব কষ্ট পেত। ক্রমে নরেশ ও দীনেশ উভয়ের প্রাণে ব্যথা সঞ্চিত হতে লাগল। নরেশ ব্যথা পেত - দীনেশ ছোট ভাই, বৌ অকারণে রাগ করে। দীনেশকে কিছু জিজ্ঞেস করলে দাদার অনুকূলে কথা বলে অথচ ঘরে গেলে মত পাল্টে যায়, বৌমার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়।

আবার দীনেশ ব্যথা পেত কারণ—অফিস হতে ক্লান্ত দেহমন নিয়ে ফিরে প্রিয়ার নিরস মুখ দেখতে হত। হোক না বীনা কাল, তাহলেও তো প্রিয়া—প্রেমদায়িনী। কাল হলে কি হবে বীনার সুঠাম দেহ রীতিমত তেমন সংযমি পুরুষদেরও মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে।

মাঝে মাঝে এই দু'জায়ের মধ্যে ঝগড়া হত। আবার মিলে-মিশেও চলত। এমনি দোটানার মধ্যে সংসারটা যেন আছাড় খেয়ে খেয়ে এগোচ্ছিল। দু'জায়ের মধ্যে ঝগড়া হলে কি হবে দুজনেই বকুলকে খুব ভালবাসত। স্নেহ করত। আপনজনের ন্যায় ব্যবহার করত। উপযুক্ত সম্মান দিত।

বকুলও এদের ভালবাসত। বিশ্বাস করত। দু'জায়ের মধ্যে ঝগড়া হলে বকুল মিটমাট করে দিত। অন্য মেয়েরাও বকুলকে মানত। সুরমা কিন্তু বকুলের এ জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারত না।

নরেশ-দীনেশের প্রসঙ্গ নিয়ে রীনা-বীনার সঙ্গে সুর সুরমার ঝগড়া হত। বকুল মীমাংসা করতে এলে সুরমা শুধু বকুলের বেলাতে ঈর্ষা পরায়ণ ছিল না উৎপলের বেলাতেও। উৎপলের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি যত্ন নিত না।

উৎপল রীনা-বীনার কাছে খুব আদরণীয় ছিল। বীনার গায়ের রং কাল। একই সংসারে দু'জায়ের গায়ের রং বিপরীত ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু উৎপল এই নারীদের গায়ের রং নিয়ে কৌতুক করত একদিন রীনা--বীনা তরকারি কুটছিল দুজনেই এলোকেশী। অনতিদূরে বকুলও অন্য নারীবৃন্দ কথা বলছিল। এমন সময় উৎপল বৌদিদের কাছে এসেই বলে উঠল—বা! কি অপূর্ব দৃশ্য! ওর হাত ও বলার ভঙ্গিমা দেখে রীনা-বীনা হতচকিত হয়ে কৌতূক দৃষ্টিতে তাকে

দেখছিল। পাশের আলাপরত নারীবৃন্দের সভাও হঠাৎ থেমে গেল।

—কি হয়েছে রে উৎপল ?

বকুল জিজ্ঞেস করল।

উৎপল আবৃত্তি করে বলে উঠল।

—আজ আমার কি সৌভাগ্য কালী - সরস্বতীর যুগল মূর্তি দেখছি !

এবার সমাগত নারীবৃন্দ হাস্যোচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল এবং উৎপলকে যে যার মত মন্তব্য ছুড়ল। বীনা হাতের কলার খোসা ছুড়তেই উৎপল সরে পড়ল।

আর একদিন !

উৎপল স্কুল থেকে ফিরল। রীনা ছোট জায়ের মাথার চুল বাঁধছিল আর বাপের বাড়ির কথায় মগ্ন ছিল। এমন সময় উৎপল হাতের বইয়ের উপর তবলার তান তুলে গান ধরল —

রীনা বীনা বাজায়
—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
অফিসে গেছে কৃষ্ণ রাম
তবু ভজি প্রভুর নাম।

বৌদিরা আর হাসি চেপে রাখতে পারল না। মনের অতি প্রিয় কথায় হাসতে লাগল। উৎপলের এই হাসি ঠাট্টার মধ্যেও রীনা-বীনার মনমালিন্য কম হত না। আর এর চূড়ান্ত ফলস্বরূপ দেখা গেল—বীনা আলাদা ভাবে হাঁড়ি কলসি কিনে রান্নার ব্যবস্থা করল। নরেশ দীনেশের মধ্যেও কথা বলা বন্ধ হল।

উৎপলের বেশির ভাগ সময় দোকানে কাটত। বাড়ির ভালমন্দের কথা জানত না। সুতরাং দাদা-বৌদির রুটিন মাফিক মনমালিন্য সম্বন্ধেও সে অজ্ঞ ছিল। মহিতোষ ফলমূল ও বিস্কুট নিয়ে বাড়ি ফিরত। ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দু-একটা বিস্কুট দিয়ে সুরমা তাদের বিদায় করত। বকুল সবই জানত কিন্তু অন্য মেয়েরা এসব কথা তুললে জিব কেটে বলত—

বৌদি টুলু মলিকে দেয়। সুরমা যখন সুনীতিকে আড়ালে ডেকে খাবার দিত বকুল তখন তার ছেলে-মেয়েকে খেলবার জন্য বাইরে পাঠাত। সুরমার ভাবখানা এমনই ছিল—উৎপল—বকুল যেন দাস-দাসী। আর তিনি মহারাণী।

হ্যাঁ সংসারের চারদিকে মহারাণীর নজরে পড়ত। মহিতোষও ভাবত সংসারের প্রতি বুঝি স্ত্রীর অনুরাগ বাড়ছে! কিন্তু একবারও এ অসারতার কথা চিন্তা করল না, যে সুরমা সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে নিজের অহংকারের পরিচয় দিতে পারে। ক্রমে মহারানী এতই পারদর্শী হয়ে উঠল যে মহিতোষকে ডিঙ্গিয়ে কথা বলতে শুরু করল।

"আত্ম দাম্ভিকতা মানুষকে বড় করে না বরং নিজের স্বাভাবিক সহজ্জাত গুণ নষ্ট করে।"

মাঘ মাসের এক রবিবার।

দোকানের কাজ সেরে ফিরতে উৎপলের অনেক রাত হল। মহিতোষ সারাদিনের হিসাব সেরে আরো পরে আসবে। বাড়ি ঢুকেই উৎপল শুনতে পেল দিদি-বৌদির মধ্যে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

ঐ একরত্তি মেয়েটাও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে: আর মাঝে মাঝে কি যেন বলছে। উৎপল কাউকে ক্রিছু বলল না। বারান্দা আঁধারে ঢাকা তাই তার উপস্থিতি কেউ টের পেল না। কিছু সময় কাটল। সুরমা যুক্তি ছেড়ে বকুলকে অপমান সূচক গাল দিল। উৎপল অসহ্য হয়ে উঠল। কলহরত দিদি বৌদির ঝগড়া থামল।

উৎপল। জিজ্ঞেস করল।

—কি হয়েছে রে দিদি?

—শোন সে ভর সন্ধ্যেবেলা সুনীতে প্যান্টটা নষ্ট করেছে। রাত সাতটা অবধি বৌদি প্যান্টটা ধুয়ে দিল না। আমি প্যান্টটা পরিষ্কার করতে বলেছি বলে বৌদি প্যান্টটা বেড়ার উপর রেখে দিল। আর আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—সুনীতি নাকি আমার চক্ষুশূল।

—তারপর কি হল?

—কি আর হবে।

বৌদিতো প্যান্টটা বেড়ার উপর রেখেই শুয়ে পড়েছে। এদিকে ওরা গন্ধে টিকতে পারছে না। এ নিয়ে বলাবলি করছে দেখে বৌদি এক বালতি জলে প্যান্টটা ডোবাল। এখন এ রাতে কে জল আনবে বল দেখি?

বকুল ঝর ঝর করে কেঁদে বলল—আমি কি তোদের এখানে বসে বসে খেতে এসেছি? না, তোরা আমায় নিয়ে এলি? বৌদি আমাকে যখন তখন খাওয়ার তুলনা দেয় কেন?

উৎপল জানত বৌদির ব্যবহার কি রকম।

তার উপর দিদির কান্না দেখে সে রাগে ফেটে পড়ল। দাদা-বৌদির মুখের উপর উৎপল কোন কথা বলত না। কিন্তু এদিন দিদির অপমানটা সে সইতে পারল না।

--ডাকিনী-রাক্ষুসী এ সংসারটাকে ডোবাল। আমাদের বোন আমাদের রোজগারের টাকায় খাচ্ছে তাতে ওর মাথা ব্যাথা কেন?

উৎপল বৌদিকে গাল দিয়ে রাগে কাঁপছিল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলাল। এতক্ষণ উৎপলের গলা শুনে আশ-পাশের যে সব মেয়েরা উঁকি মারার চেষ্টা করছিল তারা একে একে সরে পড়ল। উৎপল অনুতপ্ত হয়ে বলল--উঃ! খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছি! কি করবো?—'চুরি তো চুরি তার উপর সিনা-জারি'। চুপ করে থাকা যায়!

নিজের সঙ্গে নিজে বোঝাপড়া করে এক সময় চুপ করল। অন্যদিকে সুরমাও ভিজে বেড়ালটির মত ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। পুকুরঘাটে গেল। ভাগ্যিস উৎপলের মুখের উপর মুখ করল না। নইলে উৎপল যে কী করে বসত তা নিজেও জানে না। রাতে মহিতোষ এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল। বকুল কোন কথা বলল না। সুরমা কিল খেয়ে কিল চুরি করল।

উমেশ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মহিতোষদের বাসায় বেড়াতে এল। তার পরদিন ফিরে গেল। বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে নিল। যাবার সময় বকুল কাঁদল—কাঁদল সুরমাও। বকুল ফিরে যাওয়ায় উৎপল পড়ল বিপদে। বৌদি সম্পূর্ণ স্বাধীন--সুতরাং স্বামীর কাছে সোহাগের মানদণ্ড যেমন

বেড়ে গেল তেমনি দেবরের প্রতি অবহেলাও বেড়ে গেল ; উৎপলের সুখের দিন ফুরিয়ে গেল। দিদিও নেই ভাগ্নীও নেই। তার আদর যত্নও কমে গেছে ! আদর যত্ন কমলেও উৎপলের খুব একটা ক্ষতি হচ্ছিল না কেননা তার বেশি সময় দোকানেই কেটে যেত।

উৎপল লক্ষ্য করল বৌদির সখী বিচ্ছেদ প্রায়ই ঘটত। আবার নতুন সখ্যতাও গড়ত। মুসকিলে পড়ত উৎপল। সে কেন রীণা-বীণার ঘরে যায় !

—বুঝেছ তোমার ভাইকে বলে দাও পরের বৌ-এর দিকে এত নজর দেওয়া কেন ? আমি কি বুঝি না ; ওদের সঙ্গে এত গলাগলি কিসের ?

– কেন কি হয়েছে ? তোমার কপালে কি ছিটে ফোটাও জুটছে না ?

—দেখ, এসব কথা বলতে তোমার বাধে না ? সতী-বৌয়ের সম্মান দিয়ে কথা বলবে তবে নিজেও সম্মান পাবে।

মহিতোষ বুঝল সুরমা ভাইকে সহ্য করতে পারছে না। সুরমা কটুভাষিনী। তা হোক্। সুরমা সবার কাছে অপ্রিয় হলেও মহিতোষের কাছে তো নয়। সুতরাং স্ত্রীকে যতই আকর্ষণ করল সুরমা ততই মধু ভাণ্ডার উজাড় করে দিল। সুরমা সৌভাগ্যবতী। স্বামীর কাছে সবই পেল। স্বামী-স্ত্রীর অকৃত্তিম ভালবাসা প্রেমালাপ—কত সুখ !

তবু দুজনের মধ্যে মাঝে মাঝে অমিল ঘটত—কোথাও যেন কিছুর অভাব থেকে গেল।

মহিতোষ বুঝল সুরমার খামখেয়ালি ভাব ও নিত্য নতুন চাহিদা সহজ সরল প্রেমের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এক একদিন দেখা যেত খাওয়ার সময় সুরমা ডাল ভাত দিয়ে রীণা-বীণার সঙ্গে গল্প জুড়ে বসত। নিরুপায় দেখে মহিতোষ ডাল-ভাত খেয়েই উঠে পড়ত। এমনি ছোট খাট ঘটনার মধ্যে ভালবাসায় চিড় ধরল। ক্রমে দাম্পত্য জীবন তিক্ত হয়ে উঠল। মহিতোষ ভীষণ সঙ্কটে পড়ল। সুরমাকে শাসন করতে গিয়ে দেখল দাম্পত্য কলহ আরো বাড়ে। শাসন না করলে তার স্বেচ্ছাচারিতা বাড়ে।

দাম্পত্য কলহ প্রকাশ হয়ে পড়াটা লজ্জার বিষয়। এজন্য মহিতোষ

নিঃশব্দে সব অত্যাচার সহ্য করত। আর আশা করত সুরমার বোধোদয় হবে। কিন্তু তা আর হল না। সুরমা অশিক্ষিত, অমার্জিত রীতিনীতি ত্যাগ করতে পারল না। কিসে নিজের হিত এবং কিসে অহিত হয় তা তলিয়ে দেখত না। দাম্পত্য কলহকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে কদর্য করে তুলত। একটুতেই বিচলিত হত। কদর্য গালিগালাজ করত। মহিতোষও রুষ্ট হত। তবু যতটা সম্ভব মানিয়ে চলার চেষ্টা করত। কিন্তু ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলে অবশ্যই অঘটন ঘটত।

শরৎকাল।

একদিন উৎপল মাঠে খেলতে গেল। সন্ধ্যাবেলা ফিরল। দেখল দোকানে তার মাথা গেজোর চিপ-চিপে জায়গা টুকুতে বৌদি জানলা ধরে কাঁদছে!

প্রথমে ভাবল—আপদ জুটেছে!

কিন্তু বৌদির সজল নয়ন দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠল।

—আহা! স্বামী-স্ত্রী দুজন মানুষ, একটি সন্তান নিয়ে কত সুখেই না থাকতে পারে! তা না হয়ে কান্না। কেন জানি তার দাদার উপর খুব রাগ হল। ভুলে গেল বৌদির বাঁকা-চোরা কথাগুলো। কিন্তু একান্ত অনুগত ভাই, দাদার ইঙ্গিতে বৌদিকে বাড়ি যেতে অনুরোধ করল।

—না আর কখ্‌খনো বাড়ি যাব না।

তোমাদের বাড়ি-ঘরে তোমরা যাও। আমি গাড়ি করে কোথাও চলে যাব।

উৎপল বৌদিকে ফেরাল।

পথে যেতে যেতে ভাবল—বৌদির কি এমন দুঃখ। কেনই বা দাদা-বৌদির কলহ? কিন্তু বৌদিকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। সমবেদনা ও জানাতে পারে না। পাছে দাদার কোন রূঢ় পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে! আবার দাদা-বৌদির সম্পর্ক ভাল হলে সেই কথা আলোচনা করবে। তখন দাদা তার উপর অসন্তুষ্ট হবে। এইসব ভেবে

উৎপল চুপ করে থাকে। বৌদিও নিজের থেকে কোন কথা তাকে বলে না। কিন্তু ঘটনাটা তার কিশোর মনে ছাপ ফেলে।

· সে লক্ষ্য করল দাদা-বৌদির মধুর সম্পর্কে ছেদ পড়ল। উৎপল অসহায়ের মত শুধু লক্ষ্য করল, এছাড়া তার কিই-বা করার আছে? স্বভাবতই দাম্পত্য কলহের ছিদ্রপথে সংসার বন্ধনের মায়া কৌশলও ছিন্ন হল। সুতরাং সুরমা আরো বেশি অবুঝ হয়ে পড়ল। বায়না ধরল—সোনার হার গড়ে দিতে হবে। মহিতোষ সান্ত্বনা দিল—পূজোর পরেই হার গড়ে দেব; পূজোর মরশুমটা ভালোয় ভালোয় কাটুক।

তথৈ ব চ!

সুরমার একই কথা। মহিতোষও সাফ জবাব দিল পূজোর আগে কোন মতেই হার গড়ানো হবে না।

এজন্য স্ত্রীর অভিমান হল। সে রাত্রি উপোস থাকল। নিজে খেল না। স্বামীকেও খেতে দিল না। শুয়ে পড়ল। নিরুপায় মহিতোষ নিজের হাতে ভাত নিয়ে খেল। সারারাত ধরে মহিতোষ উস্ খুস্ করে কাটাল।

শান্তি নেই মনে! হায় মানুষের মন! সুরমা ভাবে—হার না গড়ার মধ্যে স্বামীর অবহেলা রয়েছে? মহিতোষ ভাবে— সুরমা এত অবুঝ কেন? সুরমা বোঝে না কেন হার গড়তে গেলে কতগুলো টাকা আটকে পড়ে যাবে। ব্যবসার টাকা এই পূজোর মরশুমে আটকিয়ে রাখা যায়?

পরদিন সকালবেলা মহিতোষ স্ত্রীর কাছে জমানো টাকাগুলো চাইল। কাটা ঘায়ের নুন পড়ল যেন! সুরমার সে অবস্থাই দাঁড়াল। সে মেছের উপর রুমালে বাঁধা টাকাগুলো ছুঁড়ে ফেলল। মুহূর্তে মহিতোষের মাথায় খুন চাপল। একটা থাপ্পড় মেরে বাড়াবাড়ির যোগ্য জবাব দিল। স্ত্রীর আচরণের পরিপেক্ষিতে স্বামী যে ব্যবহার করল তা কতখানি নিন্দনীয় মহিতোষ ভাবতে পারল না। রাগের বশবর্তী হয়ে উভয়ে পরস্পরের মধ্যে যে ব্যবহার করল তার জন্য উভয়ে কালিমা লিপ্ত হল। কথায় বলে নারী গৃহের লক্ষ্মী। সুরমা যদি পূজোর আগেই

গয়না গড়ার জেদ না ধরত তাহলে দাম্পত্য সুখ নষ্ট হত না। মনের জ্বালা থেকে সব অশান্তি!

যাইহোক দেখতে দেখতে শারদীয়া পূজা এসে গেল। শিশির সিক্ত আশ্বিনে মায়ের আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়ল। দোকানী সাজাচ্ছে দোকান। চাকুরেজীবিগণ পূজোর ছুটিতে বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে ব্যস্ত। দিল্লী, কানপুর, অজন্তা, ইলোরা কে কোথায় যাবি বল?

– আমি কানপুর।

— আমি ইলোরা, না – না আমি অজন্তা।

যে যার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে হৈ-চৈ বেধে গেল বারোয়ারী পূজা। বাঙালী প্রাণে সাড়া জাগায়। ধনী-দরিদ্র সবাই এ পূজোয় আনন্দের অংশীদার হয়। পূজোর মুখে মহিতোষ স্ত্রীর জন্য দামী শাড়ী কিনল। কন্যার জন্য জামা কাপড়।

কিন্তু নিজের জন্য কিংবা ভাই উৎপলের জন্য কিছু কিনল না। ভাইয়ের দুঃখ হল এজন্য। উৎপলের আরো দুঃখ হল – দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন পরীক্ষা দিতে পারল না। কেননা পূজোর আগেই অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হল। পূজা মরশুম মানেই মুনাফা লুঠার সময়। সুতরাং ব্যবসার প্রয়োজনে ভাইয়ের পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করল।

ঢাকের বাজনার তালে তালে বেচা-কেনাও বাড়ল। বিক্রি আর বিক্রি! মহিতোষের অন্য কথা ভাবার সময় কোথায়। উৎপলের বন্ধুরা তাদেরই দোকানে কেনা-কাটা করল। তারা পূজোর ছুটিতে কে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে বন্ধুকে বলতে ভুলল না। উৎপল শুনল আর বুকভরা ব্যথা নিয়ে কাজে মন দিল। কিন্তু প্রাণটা খাঁচার পাখীর মত ঝাপটা ঝাপটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। নবমী দিন পর্যন্ত দোকানে বেচা-কেনার জিরোবার সময়ও পেল। তার প্রাণে কত দুঃখ—পরীক্ষা দেওয়া হল না, কাজের চাপে দোকান থেকে বেরিয়ে ঠাকুর দেখার সৌভাগ্যও হল না। মহিতোষ ভাইয়ের দিকটা মোটেই ভাবল না। কি করবে উৎপল? পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়া কি আর ঠাকুর দেখা যায়! এ আর এক সমস্যা।

পূজোর কেন-বেচা শেষ।

মহিতোষের আনন্দ আর ধরে না। কারণ অনেক টাকা মুনাফা হয়েছে। দশ এবং একশ টাকার নোটগুলো আলাদা বাক্সে গুছিয়ে রাখল। উৎপল দাদার হাতের নোটগুলোর দিকে এক নজরে চেয়ে থাকল। মনে মনে ভাবল।

—দাদা যদি কয়েকখানা নোট হাতে গুজে দেয় তাহলে এক্ষুণি প্যাণ্ট সার্ট কিনে বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বের হয়।

কিন্তু তা আর হল না।

আঃ! দাদা শুধু নিজের কথাই ভাবে। দাদা কি নিষ্ঠুর!

মহিতোষ নিজের চিন্তায় বুদ হয়ে আছে।

ভাইয়ের কথা ভাবার সময় কোথায়? মহিতোষ ঘোরতর সংসারী। ব্যবসার সাফল্যে তার সকল আনন্দ। কিন্তু ভাই তো ছেলেমানুষ। তারও মন আছে। আছে হাসি আনন্দ। নিজের ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতাও তার হয়েছে। তারও বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। বন্ধুদের সামনে ভাল কাপড়-চোপড় পরে গেলে তার সম্মান রক্ষা হয়। কিছু সময় পেলে বন্ধুদের সাথে হেসে খেলে থাকতে পারে। পড়াশুনার সময় সুযোগ পেলে সহপাঠীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভাল ফল করতে পারে। মহিতোষ তা ভাবে না। উৎপলের মনে এজন্য ক্ষোভ আর দুঃখ বাড়তে থাকে। উৎপলের মনে হয় দাদা তাকে ভালবাসে না।

যাইহোক ৺শুভ বিজয়ার দিন উৎপল ঠাকুর দেখার জন্য ছুটি পেল। বাড়িতে কেউ নেই। বৌদি অনেক আগেই পড়শীদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে। খালি ঘর পেয়ে উৎপলের চেপে রাখা দুঃখ প্রকাশ হয়ে পড়ল। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এতক্ষণ লোকে দুঃখে কান দুটো গরম হয়েছিল। চোখ মুখ আরক্ত হয়েছিল। প্রাণটা দেহ থেকে বের হবার উপক্রম হয়েছিল। এখন নির্জনে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে কিছুটা হাল্কা হল। নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিল—বাবা-মা কাছে না থাকায় দাদা কোন যত্ন নেন না, এভাবে কি মানুষ বাঁচে ?

উৎপলের কান্না ভরা মর্মভেদী কথাগুলো চারদেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে

যেন নিজেকেই ব্যাঙ্গ করল। কান্না এক মহৌষধ। মানুষ যদি দুঃখ পায় অথচ সে দুঃখ প্রকাশ করতে না পারে তখন তার অন্তঃকরণে শোকসিন্ধু দুর্বার বেগে বইতে থাকে এবং অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে কিন্তু সে যখন নির্বিবাদে কাঁদতে পারে এবং মনের কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে তখনই তার মনের দুঃখ সরে যায়। মানুষ শান্তি পায়। কান্না দুঃখেরই প্রকাশ। সুখ-দুঃখ প্রকাশ করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। যদি কেউ মনে করেন দুর্বলেরা কাঁদে তবে তারা সঠিক নন। কেউ পর দুঃখে কাঁদে আবার কেউ নিজ দুঃখে কাঁদে মনকে সুন্দর করবার জন্য, মনোকষ্ট দূর করার জন্য। শোক নিবারণ না করতে পারলে মানুষ নিষ্ঠুর কিংবা পাগল হয়ে যেতে পারে।

নির্জনে কাঁদতে পেরে উৎপল কিছুটা হাল্কা বোধ করল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। কেউ লক্ষ্য করলে বুঝতে পারত তখনও তার চোখে-মুখে বিমর্ষ ভাব বিরাজ করছে।

দূরে বাদ্য ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল। উৎপল জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ঠাকুর ভাসাতে যাচ্ছে। অসংখ্য লোকের ভীড়ে সে তার বন্ধুকে দেখতে পেয়ে রাস্তায় বের হল। দু'বন্ধু পরস্পরকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হল।

ছুটি শেষ।

স্কুল খুলেছে। বন্ধুরা যখন পূজোর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করত উৎপল তখন অন্য গল্প গুজব করত। বন্ধুরা বুঝত উৎপল পূজোর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চায় তাই তারা তাকে কিছু বলত না। উৎপল অপ্রিয় প্রসঙ্গ থেকে রেহাই পেল।

কিন্তু মনে নেই সুখ।

বাইরে প্রকাশ করতে না চাইলেও মনে মনে ব্যথা পেত। দুঃখ তার অনেক—দাদার অনাদর, তার উপর পড়াশুনার সুযোগ পেত না।

বাবা-মার কাছে থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করত। কিন্তু দাদার কাছে থেকে তার ছাত্রজীবনের ভরাডুবি হল। দাদার ব্যবসার জন্য যতটা ক্ষতি হত তার থেকে বেশি ক্ষতি হত তার সুদিনের বন্ধুদের দ্বারা। এই

চাটুকারি বন্ধুরা মহিতোষের প্রশংসা পেয়ে সকাল বিকাল চা—তেলে-ভাজির ভোজ বসাত। এরা যুবক। বাড়ির কাজকর্মের ধার ধারত না। সুতরাং মহিতোষদার দোকানে তাস খেলে, আড্ডা মেরে সময় কাটাত। বিপদে দু–দশ টাকা ধারও পেত। এমনি হুজুগের আনন্দ উৎপলের জীবন মরণের প্রশ্ন ডুবে যেত। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে দোকানে আসত। উৎপাত করত। চুরুট ধরাত আর পথের মেয়েদের উদ্দেশ্যে অশালীন উক্তি করত।

এসব বঙ্গ যুবকদের করবার কিছু নেই।

যখন পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুবকরা তাদের দেশের সঙ্গী শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে জানাচ্ছে তীব্র প্রতিবাদ, হানছে দুর্দর্ষ আঘাত; সেখানে বাঙালী যুবকরা হাটে-মাঠে-দোকানে-স্টলে-রেস্তোরায় বসে বসে সিগারেট ফুঁক দিচ্ছে কিংবা গান্ধী-নেহেরু-নিকসন ও মাও প্রভৃতি নেতাদের পক্ষে বিপক্ষে গালভরা বুলি আওড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। পূবের বাংলা ভাষী রাষ্ট্রে যখন বাংলা ভাষার জন্য হাজার হাজার যুবক বিপ্লবে উত্তাল হয়ে উঠেছে, রক্ত দিচ্ছে, প্রাণ দিচ্ছে সেখানে পশ্চিমের বাংলা ভাষী যুবকরা উৎকট হিন্দি চলচিত্র দেখে গর্ববোধ করছে। চোঙ্গা প্যান্ট পরে মিনি ফ্রক ও লুঙ্গি ডিজাইনের পোশাক পরা যুবতির পিছনে লাইন দিচ্ছে। প্রেম পত্র বিনিময় করছে। পথের মেয়েদের বিরক্ত করছে কিংবা মহিতোষদার মত দোকানদারদের দোকানে বসে বন্ধুর অন্ন উৎখাত করছে। এ রাজ্যের কারখানাগুলোতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অবাঙালী চাকরি করে আর বাঙালী যুবকেরা চাকরি না পেয়ে বসে বসে গম-ভুট্টো খেয়ে ঝিমোচ্ছে।

উৎপলের দশম শ্রেণীতে অকৃতকার্য হওয়ার পিছনে আরও একটি কারণ হল—বার্ষীক পরীক্ষার প্রথম দিন ভাইকে দোকানে বসিয়ে মহিতোষ বাজার করতে গেল। অনেক সময় অতিবাহিক হল তবু দাদা ফিরল না। উৎপল উৎকন্ঠিত হল। স্কুলে যেতে দেরী হবে এজন্য উস-খুস করতে লাগল। এমন সময় একজন খদ্দের হল।

উৎপল খদ্দেরকে সওদা দেখাতে গিয়ে তাক ওতাকের মাল উল্টো

পাল্টা করে রাখল। কিছুক্ষণ পর সে খদ্দের আবার ঘুরে এল। কিন্তু মহিতোষ খুঁজে খুঁজে ঐ মাল পেল না। এজন্য ভাইকে খুব বকল এবং দু'চার চাপড় লাগাল।

উৎপল মনে দুঃখ নিয়ে স্কুলে গেল। পরীক্ষার হলে বসেও শোক ভুলতে পারল না। জানা প্রশ্নগুলো কেমন গোলমাল হয়ে গেল। তার মন অস্থির হয়ে পড়ল। পরীক্ষা ভাল হল না। পরীক্ষা শেষে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু সব শুনল। বন্ধুরা মন্তব্য করল– তোর দাদা শুধু কর্তব্যহীন নয় নির্দয়ও বটে। কিন্তু উৎপল এতে সান্ত্বনা পেল না। তার কেবল মনে হতে লাগল– কেন দাদা তার প্রতি এমন ব্যবহার করে? বন্ধুরা তাদের বাবা-মায়ের আদর যত্নের কথা বলে আনন্দ পায়। আর সে দাদাকে নিয়ে গর্ব করতে পারে না। দাদা এমনই সব ব্যবহার করে।

উৎপল কোমল প্রাণে ব্যথা পেল। পরে এ ঘটনা ভুলে গেল ঠিক কিন্তু প্রথম দিনের পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় মনের উৎসাহ কমে গেল। এভাবে পরবর্তী পরীক্ষাগুলো খাবাপ হল। মহিতোষের একবন্ধু উৎপলের শিক্ষক। শিক্ষক বন্ধুর কাছে ভাইয়ের সব খবরই জানতে পারে। বার্ষিক পরীক্ষার প্রথম দিন থেকে উৎপল মনমরা হয়ে ছিল, সে খবরও বন্ধুর কাছে জানতে পারল। মহিতোষ বুঝল তার রূঢ় ব্যবহারে ভাইয়ের ক্ষতি হল। মহিতোষ দুঃখিত হল। যা হবার হয়ে গেছে। আর যেন এমন ঘটনা না ঘটে তার জন্য সাবধান হল। কিন্তু ভাবলে কি হবে সহজাত ক্রোধ মহিতোষকে হটকারি করে তোলে। রাগে বিস্মিত হয়ে যায় পূর্বা-পর ভাল মন্দের কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছদ

সুরমা এসেছে প্রায় দু বছর হল।

ইতোমধ্যে সে সন্তান প্রসব করেছে। দু' সন্তানের জননী সুরমা। গর্ভবতী থাকাকালীন সংসারের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য মহিতোষ বোনকে নিয়ে এল।

বকুল আসায় সংসারে প্রাণের সঞ্চার হল।

আবার সেই প্রতিবেশিনীদের আনাগোনা শুরু হল। বকুলকে কেন্দ্র করে যেন আর একটি সংসার গড়ে উঠেছে। এ সংসারে কোন খাদ নেই। দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন নেই।

আনন্দ! শুধু আনন্দ।

নতুন শিশুর আবির্ভাব ঘটেছে। তাই গুঞ্জন ধ্বনিও বেড়েছে। সুনীতির তো আর আনন্দ ধরে না। মহিতোষ দোকান থেকে ফিরলেই সে কোলে উঠে ঘোষনা করে।—বুঝলে বাবা ভাই মিট মিট করে দেখে, ওয়া ওয়া করে কাঁদে।

ফুঁট ফুঁটে ছেলে। রাঙ্গা তার ঠোঁট।

সুনীতি আনন্দ করে ভাইকে কোলে নিতে যেত। চুমু খেত। তার আদর করার ভঙ্গিমা দেখে বকুল সুরমা হাসত। বাচ্ছা হয়েছে একমাস হল। এ সময়ে বকুল কোন কাজ করতে দেয়নি বৌদিকে। সুরমা শুয়ে শুয়ে সময় কাটাত। মলি-সুনীতি নবজাত ভাইকে আদর করত। ওরা বৌ-বৌ খেলা খেলত। অন্যদেরও দলে নিত।

মলি কাউকে মামা সাজাত। কাউকে মামী সাজাত। ভাই কাঁদে ওর মন ভোলানোর জন্য দিদি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ত। তাই বাগান থেকে প্রজাপতি ধরে আনত। প্রজাপতি দেখলে ভাই কাঁদে না। দিদি তখন স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলত।

—মামী, ভাই কি কাঁদাই না কাঁদে।

প্রজাপতি ধরে দিলুম তবে তো ভাই থামল।

—বেশ করেছ ভাগনী তুমি লক্ষ্মী মেয়ে।

—মামী, ভাইকে একটু দুধ দাও না।

—উঃ! দুষ্টু খোকা দেখছি ভাগনী!

একটু সুখে রাধতে দিলে? কেবল কান্না আর কান্না।

মাটির পুতুল মাটিতেই পড়ে থাকত। তার কান্না আর ভাল হওয়া সবই মামী ভাগনীর কথোপকথনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। এমনি করেই চলত ওদের খেলা। খেলতে খেলতে দুপুর হয়ে যেত। সুরমা

ডেকে সাড়া পেত না। মাঝে মাঝে মাটির পুতুল ভেঙ্গে দিত। ওরা কাঁদত।

এমনিভাবে ওরা একদিন খেলছিল।

এমন সময় নতুন লোককে আসতে দেখে ভয় পেল। ওরা ছুটে বাড়িতে ঢুকল। আগন্তুকও ওদের পিছু নিল। ওদের চিৎকারে সুরমা এবং বকুল দুজনেই বেরিয়ে এল। ক্ষনিক পরে মলি বুঝল আগন্তুক তার বাবা।

হ্যাঁ মহেশ সে যে পাকিস্তান গেলেন তারপর এই ফিরলেন। তিনি সঙ্গে কিছু টাকা পয়সাও এনেছেন। তিনি আগের বারই বাড়ি কেনার জন্য মনস্থ করেছিলেন। তাই এসেই একটা বাড়ি কেনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মহিতোষের সঙ্গে পরামর্শ করে দুজনে বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিলেন। মহিতোষ তৈরী ছিল। সুতরাং অসুবিধা হল না। অন্যদিকে মহেশও কিছু টাকা সঙ্গে করে এনেছেন। বাকি টাকা চাকুরীজীবী ভাই উমেশ দিল। সুতরাং যৌথভাবে বাড়ি কেনা হল।

তখন ফাল্গুন মাস।

মহিতোষ বাড়ির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাড়িতে একটি মাত্র মেটে ঘর। ঘরের চার দিকেই বারান্দা। বাড়ি কিনতে অনেক খরচ হল। সুতরাং পুরানো বাড়ি ঢেলে সাজানো সম্ভব হল না। ঘরের জীর্ণ ঘুন ধরা বেড়া তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হল। শালা-ভগ্নিপতি দুজনেরই ইচ্ছা সামনের বর্ষাটা যাহোক করে চলুক। তারপর দেখেশুনে মেরামত করা যাবে।

উৎপল দোকানে ঘুমাত।

মহিতোষ বাড়িতে থাকত। সকাল সাতটায় দোকানে যেত। তারপর বাজার করে দিলে উৎপল বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরত। এটাই প্রাত্যাহিক জীবন। উৎপল সকাল সন্ধ্যা দোকানে কাজের অবসরে পড়াশুনা করত। দুপুরে স্কুলে যেত।

এক বাড়িতে ছোট্ট দুটি পরিবার। তার উপর রক্তের সম্বন্ধ। সুতরাং একই সঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা হল। এক সঙ্গে রাঁধলে খরচও কম

পড়ে। হয় তো মহেন্দ্রবাবু দূর থেকে শুনে খুশিই হবেন। এই ভেবে, যে জামাই-মেয়ে ছেলেদের তত্ত্ববধানে এক বাড়িতে একই সঙ্গে আছে। হ্যাঁ কর্তাবাবু বছরের পর বছর ছেলের হাতে হুন্ডি করে যে টাকা পাঠিয়েছেন তার কিঞ্চিৎ হলেও মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় তিনি খুশি হয়েছেন। কারণ এই বাড়ি পিতৃপুরুষের চিহ্ন হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে। পরম্পর উত্তর পুরুষরা এই মাটিতে সুখের সংসার পাতবে।

মহেশ বেকার।

তদুপরি ভদ্রলোক কর্মবিমুখ। কোন কাজেই মন বসত না। কিন্তু তাহলে চলবে কেন? যৌথ পরিবার অন্যেরা নির্বিবাদে খেটে যাবে তা হয় না।

স্বামীব কর্মবিমুখতার সুযোগ নিয়ে সংসারে ফাটল ধরার ভয়ে বকুল সেই কাকভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত হাঁড় ভাঙ্গা গতর খেটে তা শুধরিয়ে দিত। ঝাড় পোঁচ ঘর লেপা এসব বকুলেরই কাজ। তার উপর বৌদির সঙ্গে রান্নার কাজ। পুরোনো বাড়ি। কিছু ফলের গাছ আছে। তার উপর শহর থেকে বিভিন্ন রকমের গাছ এনে পোতা হল। বাড়ির সঙ্গে একটা ছোট্ট পুকুর। চুন সুর্কি দিয়ে তার ঘাট বাধা হল।

মহিতোষ ভারী খুশি হল।

সুরমার সব ঝামেলা থেকে মুক্তি পেল। ভাড়া বাড়িতে সুরমাকে নিয়ে কি বিপদেই না পড়েছিল। এখানো তার মনে পড়ে—একদিন সুরমার অসুখ করেছিল। ওষুধ আনা হল। সুরমা রীতিমত ওষুধটা খেল না।

—মহিতোষ জিজ্ঞেস করল হ্যাঁ গো ওষুধ খাচ্ছ না যে?

—এই ওষুধ খেয়ে কি হবে?

—ওষুধ না খেলে কি জ্বর ছাড়বে?

—পুরিয়া খেয়ে কিচ্ছু হবে না। ওষুধে জোর নেই, আমার জন্য মিকচার আন।

ওষুধ না খাওয়ার জন্য স্বামী তিরস্কার করল। অতএব সুরমা একসঙ্গে সব পুরিয়া জলে গুলে খেতে বসল। মহিতোষ খুশি এ জন্য

এ ধরণের ঘটনা ঘটলে লোকের সামনে তাকে অপদস্থ হতে হবে না। সুরমা বাড়াবাড়ি করলে সে এবার দোকানে পড়ে থাকবে। তখন সুরমা মজাটা বুঝবে।

সুনীতি পাঁচ বছরের মেয়ে।

ওর পড়ার জন্য একজন গৃহশিক্ষিকার দরকার। কারণ উৎপল এবং মহিতোষ দোকানে ব্যস্ত থাকত। সুরমা স্বল্প শিক্ষিত তার উপর অনভ্যাসে সবই ভুলে গেছে। তাছাড়া শাসনের অভাব। পড়ার সময় পড়ত না। বড্ড নাক কাঁদুনে মেয়ে। তার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী রাখা হল। গৃহ শিক্ষিকার নাম প্রফুল্ল।

দিদিমণিকে ছাত্রী গ্রাহ্য করত না। প্রফুল্ল যদি তাকে মারের ভয় দেখাত তাতে আরো অবাধ্য হত। সুনীতি দিদিমণিকে কামড়াত। তার কাপড় ছিঁড়ত। চেঁচামেচি করত—এ ভীষণ জ্বালা! মা যদি ছড়ি নিয়ে আসত ও আরো জোরে জোরো কাঁদত। দু-এক ঘা পড়লে তো আর রক্ষা নেই। -মা সরস্বতী নিজেই হাল ছেড়ে বাঁচতেন।

এটুকু বয়সে সুনীতির অকাল পক্কতা দেখে অবাক হতে হয়। কাকু কি বলছে অমনি মায়ের কান ভারী করত। পিসিমা কোথায় আছে এক ফাঁকে দেখে আসত আর সুরমা কয়েকটা আম টপাটপ ফেলে দিত। অমনি ছোট খাট অন্যায় কাজ মা মেয়েকে শিখিয়েছে। এভাবে মেয়ে পটু হয়ে উঠল। তার জ্ঞান চক্ষু অপরাধ মূলক কাজের মধ্যে দিয়েই উন্মোচিত হল। সুতরাং তার মুখে কোন কথা বাধে না। মায়ের গোপন কথাও বাবার কাছে অনায়াসে বলত। মহিতোষ শুনত আর হাসত।

ভাদ্র মাসের দিন।

আকাশ কাল মেঘে ঢাকা। কখনো ঝম-ঝম, কখনো টিপ-টিপ বৃষ্টি লেগেই ছিল। চারদিকে জল আর জল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্যি ঠাকুরের দেখা পাওয়া ভার। উৎপলদের বাড়ির পথ এক হাঁটু জল ভর্তি। প্রফুল্ল সকাল আটটায় আসত উৎপলও এ সময় ফিরত। রোজ

সুনীতিকে নিয়ে নাজেহাল হত দেখে খুব দুঃখ পেত। কিন্তু তার জন্য সুনীতিকে শাসন করত না। কেননা এর আগে শাসন করতে গিয়ে বৌদির কটু বাক্য শুনতে হয়েছে। সেই থেকে উৎপল সুনীতির ভাল-কোন কথা বলত না। মাঝে-মাঝে আক্ষেপ করে বলত—আদর দিয়ে মেয়েটার মাথা খেল, এবার ঠেলা বোঝ!

উৎপল হাল ছেড়ে দিল। সুতরাং সুনীতির ভয়ের কোন কারণ থাকল না।

বাড়ি কেনার পর মহেশ ছোট ভাই এবং ভ্রাতৃ বধূকে বাড়িতে নিয়ে এল। প্রত্যহ বাড়ি থেকে অফিসে যাতায়াতে কষ্ট হলেও উমেশ এ ব্যবস্থাই মেনে নিল। কেননা সংসারের যাবতীয় খরচ তাকেই বহন করতে হয়। উমেশরা আসার পরও রান্না-বান্না যৌথভাবে হতে থাকল। বকুল জাকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হল। দু' অংশীদারের বাড়ি। উমেশ এসে বাড়ি ভাগ করে নিতে চাইল। মহিতোষ মনে করল বর্ষায় মাপের ঝঞ্ঝাট না করাই ভাল। মহিতোষের উপর বাজার করার ভার পড়ল। উমেশ মাসান্তে টাকা দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকল।

এক ফাল্গুনে বাড়ি কেনা হল।

ইতিমধ্যে আর এক ফাল্গুনও অতীতের কোলে পা বাড়াল। তারপর চৈত্র মাস। দু-মূল্যের বাজার। জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া। অতএব সংসারের খরচ বাড়ল। তার উপর উমেশ মাসিক খরচের টাকা আর বাড়াল না।

খরচের সাম্যতা রক্ষার জন্য মহিতোষ সপ্তাহে চায়দিন নিরামিষ রান্নার ব্যবস্থা করল। সবাই নিরামিষ খেতে অভ্যস্থ হল, পারল না শুধু মঞ্জু এবং সুরমা। মঞ্জু এবং সুরমা দুজনেরই ইচ্ছা সংসার আলাদা হোক। ব্যবসা মন্দ চলায় মহিতোষ এ প্রস্তাবে রাজি হল না। সুতরাং সুরমা মঞ্জুর বিষোদগার ক্রমেই বাড়ল। ফলস্বরূপ রান্নাঘরে হাঁড়ির আওয়াজ বাড়তে থাকল। দিনের বেলা রান্নাঘরে যেমন টুং-টাং ধুম-ধাম আওয়াজ বাড়তে থাকল তেমনি রাতের বেলা শোয়ার ঘরে ফিস-ফাস মন্ত্রণা। সকালে মান অভিমানে বোবা অভিনয়। খাওয়াটা অবশ্য ঠিকই জুটত।

মাঝে-মাঝে এরও ব্যতিক্রম হত—একেবারেই উপবাস। অতএব গিন্নীদের সামলানো দায় হয়ে পড়ল। চৈত্রের শেষে যৌথ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ভিন্নান্নের ব্যবস্থা হল।

এ ব্যবস্থায় সুরমা খুব খুশি হল। ভালমন্দ খাওয়ার সুবিধা হল। তাছাড়া সংসারের কাজকর্মের ক্রুটির জন্য কারুর কাছে অপদস্থ হতে হবে না। খাওয়ার ব্যাপারেও সংযমী হওয়ার প্রয়োজন নেই। বাজারের ফলমূল আর কাউকে দিতে হবে না। ছেলেমেয়েদের মনভরে খাওয়ানো যাবে।

যৌথ সংসারে মাঝে মধ্যে ছু-একটা ফল খেতে পেত। সংসার ভাগ হওয়াব পর উৎপল তাও পেল না। দাদা কি বাজার করে দেয় তা কখনো দেখতো না। দেখার ইচ্ছাও হত না। কেননা খাওয়ার ব্যাপারে চুলচেরা হুকথা বাড়লে তার খারাপ লাগত। মনে দুঃখ পেত। সুতরাং নিজে বাজার নিয়ে এলেও বাজারের সওদা সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকত। যেদিন স্কুল খোলা সেদিন তো ভাত ছাড়া আর কিছু খাওয়ার দরকার হত না। কিন্তু যেদিন স্কুল বন্ধ থাকত এবং বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকত সেদিনও বৌদি তাকে ফলমূল কিংবা অন্য কোন জলখাবার করে দিত না। সেদিন উৎপল দিদির কাছে চেয়ে খেত।

যেদিন স্কুল বন্ধ থাকত এবং বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকত সে সব দিন উৎপল বৌদির কাছে জলখাবার চাইত কিন্তু সুরমা হয়তো জবাব দিত, "স্নান করে এসে আটার রুটি করে দেব একটু সবুর করতে হবে।" অপেক্ষা করতে করতে ক্ষিদে পেয়ে যেত তবু বৌদির আর খাবার তৈরী হয় না। তখন উৎপল দিদির কাছে চেয়ে খেত। বৌদির অযত্ন দেখে উৎপলের খুব খারাপ লাগত। বৌদির কাছে যত্ন না পেয়ে যতটা দুঃখিত হত দাদার কাছে যত্ন না পেলে ততোধিক দুঃখিত হত।

পড়াশুনার প্রতি দাদার অনাগ্রহ উৎপলের সব থেকে বেশি খারাপ লাগত। ছাত্র হিসাবে উৎপল তো মন্দ নয় কিন্তু পড়াশুনা তৈরী করার যথেষ্ট সময় তো চাই। মহিতোষ যেন আর আগের মত নেই। কেননা উৎপল লক্ষ্য করল দাদা তার উপর দোকানের ভার দিয়ে চারদিকে ঘুরে

ঘুরে মিটিং করছেন। ব্যবসা এবং ভাইয়ের পড়াশুনার প্রতি মহিতোষ যেন দিন দিন নিস্পৃহ হয়ে পড়ল। দাদার এ নিস্পৃহতা দেখে উৎপল যারপরনাই কাতর হল এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে উৎকণ্ঠিত হল। দাদা কেন এমন করে? কেন এ নতুন খেয়ালে মেতেছে? উৎপল বুঝতে পারে না।

বাস্তব জীবন দিয়েই উৎপল বুঝল দাদা-বৌদি তার ভালোর জন্য মোটেই ভাবত না। উৎপল দিদির কাছে দুঃখ করে বলত—আমার আর পড়াশুনা হবে না রে দিদি! দাদা আমাকে দোকানে রেখে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। সকাল-'বকাল দু'ঘণ্টা করে নিরালায় পড়ার সুযোগ দিলেই হয়। দাদা তা বোঝে না।

দিদি চোখের জল মুছে ভাইকে সান্ত্বনা দিত। এমনি জীবনোপলব্ধির মধ্যে দু'ভাই-বোন মনে প্রাণে এক হল। ভাইয়ের বিপদে বোন, বোনের বিপদে ভাই সম অংশীদারী হল।

সুরমা ঝগড়াটে। কটুভাষী।

বকুলের সহিত অহোরাত্র ঝগড়া করলে বুঝি তার শান্তি নেই! উৎপলের জলখাবার নিয়েও অনেক গঞ্জনা সইতে হয় বকুলকে। এ মুখরা নারীটি কখন কাকে অভিসম্পাতের পাত্র করে তুলবে এবং তার ক্ষতি সাধনেচ্ছু ইষ্ট দেবতার কাছে শত সহস্রবার প্রার্থনা জানাবে বোঝা কঠিন। তবে অনুমান করা যায় তারই অভিসম্পাত কীর্তন শুনে প্রতিপক্ষ মৃতবৎ থাকলেও লাফিয়ে উঠতে বাধ্য।

বকুল কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকত বলেই বৌদির কু-কীর্তন শুনবার অবকাশ পেত না। শুনলে হয়তো একেবারে শূন্যে মিলে যেত না। এর একটা ফয়সালা হত। মাঝে মাঝে গঞ্জনা যে কানে না যায় এমন নয়। সুরমা তার খেদোক্তিটা একদিন জোর গলাতেই শোনাল।

—রুজী রোজগার করে না তাকে এত আব্দার কেন? ভাই আমাদেরও আছে।

বকুল এর জবাব দিল।

—দেখ বৌদি, তোমার মুখের যত বিষ সব উৎপলের উপর ঝরে।

আমরা তোমার শত্রু। বেশ ত ও যদি বসে বসেই খায় তুমি বলবার কে ?

—কেন! বলবো না কেন ?

তোমার ভাইটি কি এমন ধনরত্ন এনে দিচ্ছে সংসারে ?

—ও আনতে যাবে কেন ?

বাবা-মা যে বছর বছর এতগুলো টাকা পাঠাচ্ছে সে কি তার কিছু পাবে না ? আর ও বসেইবা খাচ্ছে কোথায় ? সকাল সন্ধ্যা দোকানদারি করে। আবার বাড়ি এলে বাড়ির কাজ। পড়ুয়া ছেলে নিরবিলি পড়ার একটু জায়গাও নেই, সময়ও নেই।

—করবে তো দোকানদারি। না করলে সংসার চলবে কেমন করে। পুরুষ মানুষের সবকিছু করতে হবে।

—হ্যাঁ, মোটা মোটা কথাই শিখেছ।

রাতদিন গুজ গুজ করে দাদার কান ভরাও। ওর কতটুকু যত্ন নাও ?

আর সবকিছু করবে বলে পড়াশুনা ছেড়ে তোমাদের সংসার দেখলে কি তার সারাজীবন চলবে ?

পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি এল গেল। তারপর এক সময় সবাই শান্ত হল।

এ ঘটনার সূত্র ধরে বকুল এবং সুরমার মধ্যে কথা বলা বন্ধ হল। সুতরাং সুরমার মেলামেশা করার বাকি রইল মঞ্জু। মঞ্জু কিন্তু কাজের বান্ধবী নয় কথা বলার বান্ধবী। এহেন অবস্থায় সুরমার সংসার সামলানো দায় হয়ে পড়ল। রান্না-বান্না তার উপর বাচ্চা দুটোকে সামলান চাট্টিখানি কথা নয়।

সুতরাং গদাইচরণকে কাজে বহাল করা হল। গদাই ছেলে মানুষ। সে রান্নার কাজ জানত না। সুরমা তাকে রান্নার কাজ শেখানোর চেষ্টা করল। কিন্তু এতে তার অনীহা দেখা গেল। এজন্য সুরমা তার হৃদয় বিদীর্ণ করে ছাড়ল! গদাই দুঃখ পেয়ে কাঁদত। রান্নার সময় হলেই গদাইয়ের যাতনার একশেষ। সুনীতিও গদাই দাদাকে তীক্ষ্ণ বাক্যে

জর্জরিত করে ছাড়ত—গদাই দাদা তুমি লঙ্কা বাটতে জান না! খেতে জান কাজ করতে জান না কেন?

কাজেই গদাই ফাঁক খুঁজে বেড়াত।

এমনি একদিন গদাইয়ের সাড়া মিলল না। দুপুর হল। গদাই ফিরল না। সুরমা রান্নাঘর থেকে হাঁকল—গদা, গদারে···।

তবু গদাইচরণের সাড়া মিলল না। সুরমার বাজখাই গলা আছড়ে পড়ল · ফাঁকিবাজ ছেলে! কাজের বেলা নেই, খাওয়ার সময় ঠিক হাজির হবে। ঘরে এস বাছাধন তোমায় বেশ করে খাওয়াব।

অনুপস্থিত চাকরের উপর আক্ষেপ করতে করতে অনেক সময় কাটল। ক্রমে খাবার সময়ও হয়ে এল। তবু গদাই এল না। মহিতোষ বাড়ি ফিরল। স্ত্রীর অলঙ্কারের অবিরাম মৃদু ঘর্ষণের আওয়াজ ও কাঁসার পেতলের ঝনঝনানি থেকে বুঝতে বাকি রইল না আজ গদাই চরণের ছুটি। কেননা আসার সঙ্গে সঙ্গে সুনীতি জানান দিয়েছে গদাই দাদা কোথায় গিয়ে বসে আছে।

বিপদের গন্ধ পেয়ে মহিতোষ সাবধানে গদাইচরণকে ডাকা-ডাকি করল। তবু গদাইয়ের সাড়া পাওয়া গেল না। মহিতোষ স্নান সেরে খেতে বসল। সুরমা এদিক ওদিক ধুপ-ধাপ পায়ের শব্দ সহকারে ঝড়ের বেগে যাওয়া-আসা করল। সে কাঠঠোকরা পাখির মত ভাতের হাঁড়িতে ঠক্-ঠক্ শব্দ করতে করতে বজ্রপাতের মত স্বামীকে জানাল—দেখছ কাজের ছেলের কীর্তি! সারাদিন ভোঁ-ভোঁ করে ঘুরে বেড়াবে। একটা কাজ ধরবে না, এলে ঝাটা দিয়ে তাড়াব।

—থাক্ থাক্ তোমার অত কষ্ট করতে হবে না। তার আগেই ছেলে কেটে পড়েছে। তোমার মুখের যে বিষ তা গদাই কেন? আরো কত যাবে আসবে, সবে তো শুরু।

—অ্যা! কি বললে আমার মুখে বিষ?

না-না বিষ নয় মধু। একটু মস্করা করেছি - বুঝলে না!

—যাবেই তো, তাই বলি ছেলেটার কি দোষ?

লোকে আমার সুখ সইবে কেন? বুঝেছো যত নষ্টের মূল তোমার

ঐ বোনটা—কৌশল্যা ! একেবারে কৌশল্যা। ছেলেটাকে কুযুক্তি দিয়েছে। তাই তো ছেলে গেল। দেখনা এবার তোমার ভাইটাকেও নষ্ট করল বলে।

পাশের ঘর থেকে বকুল শুনতে পেল। মহিতোষকে জিজ্ঞেস করল।

দাদা, আমার নামে এতগুলো মিথ্যে কথা বলছে। আর তুমি শুনতে পাও না ?

দাদা বোনকে সান্ত্বনা দিল।

—কিছু মনে করিস না বোন। কৌশল্যা বলেছে ঠিক। তবে কৌশল্যা তুই নয়—যে বলেছে সে নিজে। আমার দিকে তাকিয়ে একটু মানিয়ে নে। কথা বাড়াসনে।

মহিতোষের কথায় বকুল শান্তি পেল। তবু এতবড় একটা অপবাদের জন্য ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। সুরমাও পরিস্থিতি উপলব্ধি করে চুপ করল।

এ ঘটনার পর বকুল সুরমাকে এড়িয়ে চলত। কথা বলত কম। সুরমা নিজের ভুল বুঝতে পারল। সুতরাং বকুল যতই উপেক্ষা করুক না কেন, যেচে তার সঙ্গে কথা বলত। কিন্তু ভুল স্বীকার করে মার্জনা ভিক্ষা করতে অহং-এ বাধল। বকুল সবই বুঝত। দাদার দিকে তাকিয়ে সব মেনে নিল ঠিক কিন্তু বৌদির প্রতি বিতৃষ্ণা থেকেই গেল। মন থেকে মুছে ফেলতে পারল না। ফলে বৌদি-ননদের কথাবার্তা হত ঠিক কিন্তু আন্তরিকতা থাকল না।

এর কিছুদিন পর একদিন সকালে প্রফুল্ল সুনতিকে পড়াচ্ছিল। উৎপল বাজার নিয়ে ফিরল। কিছুক্ষণ নিবিকার চিত্তে ওদের পড়াশুনা দেখল। তারপর বলল।

—আজ আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

কেন বলুন তো ?

প্রফুল্ল ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে এমন ভঙ্গিমাই করল যে মাথার একরাশ বেণী বাঁধানো চুল হেলে-দুলে উঠল। উৎপল মৃদু হেসে চেয়ারখানা টেনে বসল। কেন জানি অজানা কারণে তার মনটা সেদিন

খোলা আকাশের মত উন্মুক্ত ছিল। তাই সুনীতির কাঁচা হাতের লেখাও তার কাছে খুব ভাল লাগছিল। হঠাৎ যেন কথা খুঁজে পেল না। কোন কথা বলবে তাই যেন মনে মনে চিন্তা করছিল। প্রফুল্ল সংকোচ বোধ করল। হয়ত বা মনে মনে ভাবল এ কেমন ভাব! তাই আরক্তিম বদনে প্রশ্ন করল।

—বড্ড চুপ করলেন যে!

—ওহো—হো—হো, আপনার ছাত্রীর উন্নতি।

দুজনেই এবার হেসে উঠল।

ছাত্রী আরো গভীর ভাবে লেখায় মন দিল। সত্যিই ছাত্রীর উন্নতি হয়েছে। কোথা থেকে মঞ্জু এসে টিপ্পনি কাটল এবং হাসির বানে সমস্ত জড়তা ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। কটাক্ষে প্রফুল্লের দিকে তাকিয়ে বলল।

—হ্যাঁ ভাই উৎপলকে কাছে কাছে রেখো তাহলে সবদিক থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। ছেলেটা মন্দ না তোমার উপযুক্ত হবে।

এমন একটা রসিকতার জন্য প্রফুল্ল বা উৎপল কেউই প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং প্রফুল্ল মাথা নীচু করে ছাত্রীর কাজে মন দিল। উৎপল প্রতিবাদ করল।

—থাম পোড়ারমুখী! বকে বকে তোর মাথা খারাপ হয়েছে। দেখছিস বেচারী কেমন লজ্জা পেল।

উৎপল মঞ্জুর মাথায় চাটি মারতে উদ্যত হল। মঞ্জু ছুটে পালাল বকুলের কাছে। উৎপল ক্ষণিকের লজ্জাকে এড়ানোর জন্য পিছন পিছন ছুটল।

—দেখ দিদি, তোমার ভাই দুষ্টুমি করে।

—বেশ বেশ আর ন্যাকামো করতে হবে না। দিদির কাছে কতক্ষণ থাকতে পারিস দেখব।

উৎপল ফিরে এল। প্রফুল্লকে মৃদু ভর্ৎসনা করল।

—দিদি অমন করে বলে গেল আর আপনি চুপ করে গেলেন?

—দিদিরা যখন বলতে জানে বলুক না, আমার তো কোন ক্ষতি হয়নি।

ওরা দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। উৎপল কখনো দিদি কখনো পোড়ারমুখি, কখনো বা হতচ্ছাড়ী বলে মঞ্জুকে সম্বোধন করত। দিদির জা—দিদি। কিন্তু ওদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মত। বাল্যবন্ধুর মত হাসি মস্করা করত। স্কুল কিংবা বাইরে থেকে ফিরে মঞ্জুকে সামনে পেলে মাথায় চাটি মারত সঙ্গে সঙ্গে নানা মন্তব্য করত! মঞ্জু চেঁচাত আর বলত।

—পোড়ারমুখীর জন্য আমার শান্তি নেই।

উত্তর আসত।

—মাথাটা ওবাড়ি রেখে আয় তবে তোর শান্তি।

উৎপল মাঝে মাঝে মঞ্জুর চুল টেনে বলত।

—এ রাম! চুলে জটা ধরেছে।

বিদেশে বিক্রি করলে পয়সা পাওয়া যেত।

মেমরা পরচুলো ভালবাসে।

মঞ্জুরও সমানে সমানে জবাব দিত।

—আমি তোকে বিদেশে চালান দেব।

সাহেবরা উৎফল ভালবাসে মাকাল ফল নয়।

—ওরে আমি উৎফল নই—উৎপল, মানে পদ্ম। অতএব তুই ঠকলি।

প্রফুল্ল এই সব দেখে-শুনে অভ্যস্থ হয়ে গেল। সেও মাঝে মাঝে মসকরায় অংশ গ্রহণ করত। আর সুরমা! রসাস্বাদনে সুরমাও কম যায় না। সুযোগ পেলে ছড়া কাটত।

রসিক কালা চাঁদ
পেলে প্রেমের স্বাদ
স্বপনে দেখে শুধু
সে আমার বধূ।

সুরমার মন যখন ভাল থাকত তখন দেওরের সঙ্গে এরকম রসিকতা করত। উৎপলের ভাল লাগত। ভাবত বৌদি খুব ভাল। মনে জমানো যত রাগ থাকত তখন সব জল হয়ে যেত। কিন্তু স্বার্থের ব্যাপারে বৌদি খুব টনটনে। বৌদির এ দোষটা উৎপল কিছুতেই মেনে নিতে পারত

না। সময় সময় উৎপল বুঝে উঠতে পারত না। অলসতার জন্য সময়মত খাবার তৈরী করে উঠতে পারত না—না ইচ্ছা করেই করত না।

হ্যাঁ অলসতার কারণেই সুরমা অনেক সময় স্বামীর প্রতিও যত্ন নিতে পারত না। কেননা প্রায়ই দেখা যেত সুরমার ঘুম থেকে উঠতেই বেলা হয়ে যেত। তারপর নেয়ে থুয়ে ঘরের কাজ করত। বাসন-কোসন মেজে ছেমেমেয়েদের সকালের খাবার দিতে দিতেই অনেক বেলা হয়ে যেত। তারপর রাঁধতে বসত। আর এক এক দিন বাজারও আসত দেরীতে। স্বাভাবিক কারণে রান্না দেরীতে হত এবং উৎপলেরও স্কুলে যেতে দেরী হত।

কোন কোনদিন দেখা যেত স্কুলের সময় শুধু ভাত হয়েছে। সেদিন উৎপল দিদিদের সদ্য রান্না করা বা বাসি তরকারি দিয়ে খেয়ে স্কুলে যেত। ছুটে ছুটে গিয়েও অনেকদিন সময় মত স্কুলে ঢুকতে পারত না।

হাঁসে ডিম পাড়ত। উৎপল স্কুলে গেলে সুরমা মামলেট করে খেত। অথচ উৎপলের জন্য একটা ডিম মামলেট করে দিলে ভাল হয় কিনা একথা ভাবলেও সুরমার গায়ে জ্বর আসত। হাঁস পালে সুরমা উৎপল ডিম খাওয়ার কে ? সুরমা সোজা কথা লোক।

—হ্যাঁ সময় মত বাজার এনে দাও রান্না করে দেব। না হয় নুন ভাত খেয়ে যাও।

প্রথম প্রথম বকুল এ নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা করেছিল। তারপর বুঝল উৎপলের খাওয়ার জন্য বৌদির শুধু আন্তরিকতার অভাব নয় ইচ্ছাও নেই। তাই ভাইয়ের জন্য রাতে একটা তরকারি রেখে দিত। পরদিন সে তরকারি দিয়ে খেয়ে উৎপল স্কুলে যেত। এ সময় সুরমা কাজের ভান করে অন্যদিকে ফিরে থাকত। দেখেও দেখত না। পরে কথায় কথায় বলত।

—এত কষ্ট করে দেবরকে খাওয়াচ্ছি বড় হলে ফিরেও তাকাবে না।

এসব কথা শুনলে বকুলের গা জ্বলে যেত। তবু অঘটনের ভয়ে জবাব দিত না. বরং বৌদিকে সাবধান করে দিত– বেশত বৌদি বাজার

যখন দেরীতে আসে ও স্নান করে আসতে আসতে একটা মাছের ভাজি কিংবা ডিমের মামলেট করে দিতে পার। না বাপু তোমার দেখছি বুদ্ধি সুদ্ধি নেই।

বকুল জানত বুদ্ধির অভাব না বৌদির অনাদর। তবু বুদ্ধি সুদ্ধির কথা বলত? যাতে লাঠি না ভাঙ্গে অথচ সাপও মরে। সুরমাও ভেজা বেড়াল সাজত।

—করিত ঠাকুর-ঝি না হয় কি খেয়ে স্কুলে যায় বল? তবে সব দিন তো সমান যায় না।

বকুল মনে মনে বলত—আমার তরকারি দিয়ে যে উৎপল খেয়ে স্কুলে যায় তা তুমি এ জন্মেও স্বীকার করবে না। এরপর কথা বলতে ইচ্ছা করত না তবু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আবার সাবধান করে দিত।

—সব দিন তো আর বাজার দেরীতে আসে না। যে দিন দেরী দেখ সেদিন একটা ডালের তরকারি করতে পার। ঘরে এক বেলার তরকারি রেখে দিতে পার।

এসব কথায় সুরমার মন ভিজত না। এরপর যেই সেই। অতএব ফলটাও সহজে অনুমেয়। উৎপল আধা পেটে স্কুলে যেত। মনের দুঃখ মনেই থাকত। বৌদির উপর ঘৃণায় মন ভরে যেত। ফলে বৌদিকে শ্রদ্ধা করতে পারত না। প্রয়োজনাধিক কথা বলত না সুরমার সঙ্গে।

তার উপর অহেতুক কারণে দিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে শুনলে সেদিন তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিদ্রোহ করুন। বৌদির মুখের দিকে তাকাতেও ইচ্ছা করত না।

মানুষের মনের ভাব কখনো গোপন থাকে না। সুরমাও একটা কারণ খুঁজে পেলে মুখ হাড়ি করে থাকত। কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে বিষ ঢেলে দিত। এই বৌদিটি কথায় কথায় এতই তেতো ঢেলে দিত যে দেবরটির পক্ষে হজম করা মোটেই সহজ ছিল না। তবু উৎপল বিদ্বেষ ভাবকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। তাহলে কি হবে যথেষ্ট মতানৈক্য ঘটত—দুকথা বাড়ত। এটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি যত্ন নিতে জানে না সে কেমন করে দেবরের প্রতি যত্ন নেবে।

আটার রুটি হাঁসে, মুরগীতে খায়। অথচ মহিতোষ খালি পেটে থাকত। টিফিন না করেই বাজারে যেত। বকুল সকালে উঠে রুটি, চা করে সকালের টিফিনের ব্যবস্থা করত। মহিতোষ মাঝে মাঝে বকুলের দেওয়া টিফিন খেয়ে এক ঘটি জল খেত। আর বোনকে বলত।

—ঘরের রুটি আমার জুটবে না রে!

সুরমা রাগে টগবগ করত। বাসি বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলত।

–এত আব্দার কেন? বাজারে গিয়ে টিফিন করলেই তো হয়।

উৎপল মাঝে মাঝে অবাক হত।

দাদা বৌদির যত্ন পেত না। দিদির যত্নে কত উপকৃত হয়েছে। তবু দাদা কেন দিদিদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে!

একদিন উৎপলের স্কুল বন্ধ ছিল। দাদা বল্লেন, বাড়ি গিয়ে পুকুর পাড়ে সীমের মুড়ো করবি। পূব পাড়ে বকুলরা যে মুড়ো করেছে তুই একটু মাটি ছড়িয়ে তার উপর কচুরি পানা দিনে ঢাকা দিবি।

—ওদের বুড়োর উপর পানা দেবো কেন? তাহলে ওরা বকবে।

—ওরা যদি কিছু বলে তবে তুই বলিস 'আমরা এপারে মুড়ো করবো তোমরা ওপারে কর।

—ওরা যদি জিজ্ঞেস করে কে একাজ করতে বলেছে তাহলে কি বলব?

—ন্যাকা যেন।

বলবি কেউ বলেনি আমিই করছি। তোমরা ভাল জায়গা বেছে নিলে আমরা যাব কোথায়?

উৎপল দাদাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। বাড়ি এসে দাদার কথামত কাজ করল।

মহেশ বাড়িতেই ছিলেন।

বকুল এর কারণ জিজ্ঞেস করতেই সে ঝর ঝর কর কেঁদে বলল—আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব নারে দিদি, দাদা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

কথাটা সবার কানেই গেল। উৎপল বুঝল বিপদ আসন্ন। তবে সেটা যে কি বুঝতে পারল না। মনে মনে শঙ্কিত হল।

--ছাই! যা হয় হবে।

কিন্তু হঠাৎ দাদা এমন আচরণ করলেন কেন? দাদা অসুবিধে মনে করলে একটা বোঝাপড়া করতে পারতেন। আমাকে এর মধ্যে জড়ালেন কেন?

মনে প্রশ্ন জাগল অনেক। কিন্তু উত্তর খুঁজে পেল না। দাদার মতি গতিও কোন দিনই বুঝতে পারল না। দুপুর বেলা স্নান সেরে খেতে বসল এমন সময় মহিতোষ ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নীর মুখে সব শুনতে পেল।

--উৎপল এসব কি শুনছি!

—আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না। ওরা জিজ্ঞেস করলে আমি সত্য কথা বলেছি।

মহিতোষ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। অন্যেরা যেন না শুনে তার জন্য অদম্য চেষ্টা করে মুষ্ঠাগত হাত নাড়াতে নাড়াতে থামা চাপা অথচ ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলল।

মহাপুরুষ! মিথ্যে কথা বলতে জানেন না। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকল মহিতোষ।

আরো পরের কথা।

নতুন বর্ষা নামার আগেই দু-শরিকের মধ্যে বাড়ি ভাগ করে নেওয়া হল। বর্ষা নামল। বাড়ির কাজকর্মও বাড়ল। বাড়িতে শাকশব্জি লাগান হল। বর্ষায় আনাচ-কানাচ জঙ্গলে ভর্তি। স্কুল থেকে এসে উৎপল জঙ্গল পরিষ্কার করত। শশা ঝিঙ্গে গাছ লাগান হত। সঙ্গে দাদাও থাকত।

ভাদ্র মাস।

সুরমা তখন অন্তসত্বা। সুতরাং রান্নাবান্নার জন্য একজন পরিচাবকের দরকার হয়ে পড়ল। সুরমা ভাঙ্গবে তো মচকাবেনা। ঠাকুরঝিকে সাহায্যের জন্য ডাকল না। অথচ মঞ্জুর সঙ্গেও কথা বলা বন্ধ হল।

সুরমার ব্যবহারে আপনজন সবাই বিরক্ত।

যে উপকার করে। পরের দুঃখে সব মান অভিমান ভুলে যায় তাকে শত লাঞ্ছনা করলেও পরের বিপদে ছুটে আসে। বকুলও তাই। নিজের থেকে এসে ভাইদের রান্না করে দিত। এমতাবস্থায় মহিতোষ আবার গদাইকে নিয়ে এল। গদাইকে রান্নার কাজ বুঝিয়ে এসে কান্না জুড়ে দিল।

—আমার তেল নুন এসব গেল কোথায় ?

এ কয়দিনে বুঝি সব শেষ ! আমি কি কাউকে রান্নার জন্য ডেকেছি যে আমার এ সর্বনাশ হল ?

বকুল দুঃখ পেয়ো না। সংসারের এটাই নিয়ম। উপকারীর দুর্নাম করাই সাধারণ ধর্ম। তোমরা সব গ্লানিকে মাথায় তুলে নিয়ে পরের উপকার কর বলেই খাঁটি মানুষ।

পাঁচ বছর অতীত হল উৎপল মাতৃভূমি ছেড়েছে। এর মধ্যে দুটো বছর নষ্ট হল। এখন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। ঐ দুটো বছর নষ্ট না হলে সে হয় তো এত দিনে শিক্ষা জীবনের একটা অধ্যায় শেষ করতে পারত। যাইহোক সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকাব। কিন্তু সে সুযোগ কোথায় ?

ব্যবসা আর পড়াশুনা এক সঙ্গে দুটো করা সম্ভব নয়। উৎপল দুশ্চিন্তায় পড়ল। কি করা যায় ? দাদার বন্ধুরা আর এক আপদ। দাদার নিবুদ্ধিতার জন্য আরো ক্ষতি হল। উঃ ! দাদা যদি তাকে পড়াশুনার জন্য কিছুটা সময় দিত ! উৎপল তাহলে মহানন্দে পড়াশুনা করতে পারত।

এই দুঃসময়ে উপেন্দ্র এসে উপস্থিত হল। উপেন্দ্র তাদের পিসতুত ভাই। উপর্যপরি গণ্ডগোলে মহিতোষরা বিদেশাভিমুখে আগমনের কিছুদিন পরে উপেন্দ্র আগরতলায় এসে উপস্থিত হল। সে স্বদেশে তেলের মিলে কাজ করত। ঐ মিলের মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত রমেশ সাহা। দেশের পরিস্থিতি ভাল নয় দেখে তিনি একে একে হাতগুটিয়ে নিলেন এবং আগরতলা শহরে ছোটখাট একটা মিলের গোড়াপতন করলেন।

দেশে রমেশ সাহার প্রচুর ধন জন ছিল। খ্যাতিমান ব্যবসায়ী হিসাবে প্রচুর নামও ছিল। এ হেন ভদ্রলোক আগরতলায় এসে খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। তিনি বলতেন ব্যবসা লক্ষ্মী।

তার সরষের তেল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হত। বস্তুতঃ ঐ শহরের বেশির ভাগ তেলের মিলগুলো হিন্দু সাহাদের হাতে ছিল। উপর্যপরি দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে অনেকে এদিক ওদিক সরে পড়ল।

রমেশ সাহার টিন ঝালাইয়ের কনট্রাক্টর ছিলেন মনীন্দ্র সাহা। শহরেব উপকণ্ঠে ছিল তার বাড়ি তিনটি প্রাণী নিয়ে ছিল তার সংসার। তিনি নিজে তার স্ত্রী ও আদুরে কন্যা শান্তা। শান্তা ছিল মাংসাসী ও কালো। বাপের গায়ের রং থেকে যতটা কালো মায়ের গায়ের রং থেকে তত্তোধিক সুন্দর। অতএব পাঠক মহোদয় সহজেই অনুমান করতে পারছেন শান্তার মায়ের গায়ের রং কেমন ছিল? এক কথায় তিনি যেখানে যেতেন সেখানে অমাবশ্যার উদয় হত। তিনি যখন হাসতেন তখন মনে হত কয়লার স্তুপের মধ্যে রুপোর ঝিলিক খেলছে। কিংবা অমাবশ্যা রাতে বিদ্যুৎ চমক হল।

মহোদয়গণ এর বেশি বর্ণনা দিয়ে শান্তার মাকে দুঃখ দিতে রাজি নই। তাহলেই বুঝতে পারছেন এ হেন কাল মায়ের মেয়েটির রূপশ্রী কেমন? যাইহোক উপেন্দ্র এই মনীন্দ্রবাবুর অধীনেই কাজ করত। কাজটা তার এক আত্মীয়ের তদারকিতে জুটেছিল। তিনি যখন উপেন্দ্রকে নিয়ে শান্তার মার সঙ্গে দেখা করেন তখন শান্তার মা জিজ্ঞেস করল।

—বাবা তোমার নাম কি?

—আমার নাম উপেন্দ্র।

—তোমার বাড়ি শহর থেকে কত দূরে?

—অনেক দূর।

—তাহলে কি করে কাজ করবে?

—শহরে বাসা ভাড়া করে থাকব।

—বেশ তো তাহলে আমাদের বাসাতেই থাক।

অতঃপর উপেন্দ্র কয়লাখণ্ডের পদমূলে ডিপ করে একটা প্রণাম করল।

সেই থেকে উপেন্দ্র পোষ্যিপুত্রের মতই রয়ে গেল। শান্তার মা বাবা মনে মনে ভাবল—অকূলে কূল পেলাম।

সুখেই দিন কাটছিল।

হঠাৎ এল দাঙ্গা। সপ্ন গেল ভেঙ্গে।

মনীন্দ্রবাবু আন্দামানের দিকে পাড়ি দিলেন। উপেন্দ্রকে নিতে চাইলেন সঙ্গে। উপেন্দ্র গেল না। এজন্য শান্তা কাঁদল বিস্তর। শান্তার মা-বাবা নিরাশ হলেন। তারপর বহুদিন কেটে গেল। কেউ কারুর খোঁজ রাখল না।

শান্তারা চলে যাওয়ার পর উপেন্দ্র আগরতলায় রমেশবাবুর মিলে একটা কাজ জুটিয়ে নিল। সেখানে উপেন্দ্র খোঁজ পেল কোলকাতায় নাকি টাকা উড়ে বেড়ায়। উপেন্দ্রের বড়লোক হবার সাধ হল। খোঁজ করে মহিতোষদের ঠিকানা যোগাড় করল। কিছুদিনের জন্য কোলকাতায় দাদাদের কাছে বেড়াবে বলে মালিকের কাছ থেকে ছুটি নিল। নিদৃষ্ট সময়ে কোলকাতা অভিমুখে যাত্রা করল।

পথিমধ্যে হল ট্রেন ডাকাতি। উপেন্দ্র সর্বস্ব হারাল। রিক্ত হস্তে দাদাদের বাসায় উঠল।

এদিকে বন্ধুবান্ধবহীন উৎপল দাদা-বৌদির স্বক্রোধের মধ্যে থেকে বিরক্ত ও অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ল। এ সময়ে তার একজন সমব্যথীর প্রয়োজন ছিল—যে বুঝবে তার মনের কথা নিভাবে বিগত বছর গুলোর পুঞ্জিভূত শোকাগ্নির লেলিহান শিখা!

যে দিতে পারবে সান্ত্বনা।

সে হবে তার দুঃখের সমভাগী। গ্রীষ্মের দাবদাহ আগুনের ছটায় প্রকৃতি যেমন তৃষ্ণার্ত ও নির্জীব হয় আবার আষাঢ়ের নতুন বৃষ্টির জলে সজীব হয়ে উঠে তেমনি উৎপলেরও একান্ত প্রয়োজনের দিনে সমুদ্রে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় উপেন্দ্রকে পেয়ে খুব খুশি হল।

উপেন্দ্র সহায় সম্বলহীন।

হাতে টাকা পয়সা না থাকায় লৌকিকতা কিংবা আমোদ ফুর্ত্তি কোনটাই হল না। এ হেন অবস্থায় বৌদির বদান্যতার উপর নির্ভর

করতে হল। দেখতে দেখতে ছুটির দিন ফুরিয়ে গেল। তার স্থির বিশ্বাস জন্মাল রমেশবাবু পুনরায় কাজে বহাল করবেন না। কাজ যখন হবে না আগরতলায় গিয়ে আর লাভ কি ?

কোলকাতায় কাজ পেলে ভাল হয়। এ জন্য দাদাকে ধরল। দাদা নিশ্চেষ্ট।

কিছুদিনের মধ্যে উপেন্দ্র বুঝল কোলকাতায় টাকা উড়ে ঠিকই তবে ধরা কঠিন। শুধু তা নয় এখানে শুভকাজে মানুষের ইচ্ছা সীমাবদ্ধ। একটু ফসকালেই অতল তলে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আরো বুঝল এই কোলকাতায় একদিকে টাকার পাহাড় স্তূপিকৃত কিন্তু সাধারণের নাগালের বাইরে। অন্যদিকে দুঃখ দারিদ্রতা করাল মৃত্যুর থাবা ওত পেতে আছে। একদিকে শোষণ আর বঞ্চনা অন্য দিকে পাখার তলায় নরম শোফায় শুয়ে শুয়ে বড়লোক হওয়ার সপ্ন !

এ বিপরীত চিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে উপেন্দ্রের বড়লোক হবার সাধ তো গেলই এমনকি পেট বাঁচানো দায় হয়ে পড়ল।

বাধ্য হয়ে দাদা-বৌদির ফাই-ফরমাসই মূলধন হয়ে দাঁড়াল। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেটে খেটে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ল। শুধু খাটুনি ! তার উপর বৌদির রোষাগ্নি।

সারাদিন বৌদির বকা ঝকা খেয়ে সন্ধ্যার পর উৎপলের কাছে দুঃখের কথা জানাত।

সমব্যথী, উৎপল তাই উপেন্দ্রের দুঃখ বুঝত। কিন্তু নিরুপায়। ভাই হল বন্ধু। একদিন দু-বন্ধু যুক্তি করতে বসল।

—তোমার আগের মনিবের কথা মনে পড়ে ?

—হ্যাঁ, পড়ে !

—তারা এখন কোথায় ?

—আন্দামানে।

—তুমি তাদের ঠিকানা জান ?

—জানি।

—তবে ঠিকানাটা আমায় দাও, চিঠি লিখে দেখি কোন ব্যবস্থা করা

যায় কিনা ?

উপেন্দ্র ঠিকানা দিল।

উৎপল আদ্যপ্রান্ত সব জানিয়ে মনীন্দ্রবাবুকে একটা চিঠি লিখল এবং একটা উপায় স্থির করতে অনুরোধ করল। তিনি যথাসময়ে উত্তর দিলেন। উৎপন্দ্রকে মনিঅর্ডার করে টাকা পাঠালেন। উপেন্দ্র আন্দামান চলে গেল।

এরপর উপেন্দ্রের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। সুতরাং আমরা আর তাকে দেখতে পাব না। কে বলতে পারে সে কালো মেয়েটির পানি গ্রহণ করেনি! অথবা সে নিজের কঠোর পরিশ্রমে ও বুদ্ধি বলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে!

উপেন্দ্র আন্দামান যাওয়াতে উৎপল খুশি হয়েছে। উঠতে বসতে দাদা-বৌদির কথা শোনার মধ্যে যে কি জ্বালা উৎপল তা ভাল ভাবেই জানত। তাই উপেন্দ্রের দুঃখ সে বুঝত। উপেন্দ্রকে আন্দামান যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে সে বন্ধুর প্রতি কর্তব্য পালন করল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিন হল সমাপন।

জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হল পূর্বগগণ।

তবু কে গো ভাবছ বসে গাছের তলায় ?

এ সুন্দর সন্ধ্যা বেলায় ?

—হ্যাঁ ভাব।

জ্যোৎস্নার আলোতে মৃদু-মন্দ পবনে বসে বসে ভবিষ্যতের কথা ভাব।

কিন্তু!

কে এই যুবকটি ?

ইনি আমাদের সেই সমব্যথী হারা উৎপল।

তা ভাল।

কিন্তু এটুকু বয়সে কিসের এত ভাবনা ? বলতো উৎপলবাবু। এই

তো সবে যৌবনে পা বাড়ালে। তা এখনই জরার চিহ্ন কেন?

এ সময় শরীর থাকবে তেজ বীর্জতায় পরিপূর্ণ, হবে ইস্পাত কঠিন মন। প্রাণে লাগবে বসন্তের দোলা। খেলাধূলা আর হাসি খুশিতে মন থাকবে ভরপুর। মন মাতানো গান আর উৎসাহ উদ্দীপনার এই তো সময়। যুবতীদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করার এই তো সময়। হাসি খুশিতে ভরপুর হয়ে থাকবে। আনন্দ করবে। তবেই তো ওদের নজর পড়বে। দুঃসাহসিক বীরপুরুষরাই তো ভাগ্যবান।

তা নয়, ফুটন্ত যৌবনে বাধ্যকের আচরন। কেবল ভাবনা।

—তা হোক, যুবক বলে কি পাথেয় কিংবা সারা জীবনের কথা ভাবতে নেই।

যৌবনের ডাক এলে কি হবে, তা বিকাশের সুযোগ কোথায়?

এজন্য লোকে বলে খাচার পাখি কি আকাশে ডানা মেলা পাখির মত সুখী?

উৎপলেরও বাঁধন রয়েছে। অতন্দ্রপ্রহরি দাদা-বৌদির। দাদা-বৌদির খাম খেয়ালিপনা তাকে ভাবিয়ে তুলছে।

হ্যাঁ উৎপল ভাবছিল নিজের কথা।

মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিল—সাবধান হও, আত্মীয় পরিজন সবাই স্বার্থের দাস। বিপদে তাদের সাহায্য না পেলেও সুদিনে তারা উড়ে এসে জুড়ে বসবে।

হ্যা উৎপলের অভিজ্ঞতা সেরকমই।

সামাজিক সুখ-সাচ্ছন্দ সব দেওয়া নেওয়ার সূত্রে গাঁথা। আত্মীয় নিজের কর্তব্য না করলেও অন্যের কর্তব্যে ত্রুটি ধরতে সদা সচেতন। সামাজিক নিয়মগুলো উৎপল জীবনাহুতির অগ্নিতে পরখ করে নিল। ঠকে শিখল অনেক। বুঝল সমাজের পারস্পরিক কর্তব্য অর্থকেন্দ্রীক। আশ্চর্য মানুষের মন। প্রেম-প্রীতি ভালবাসা সবই যেন অর্থের নিরিখে তুল্য মূল্য।

উৎপল এসব মানবিক সম্পর্কগুলো বুঝতে শিখল মা-বাবাকে ছেড়ে আসার পর। মা ও মাতৃভূমিকে স্মরণ করত আর কষ্ট পেত। যত দিন

যেতে লাগল স্মৃতি রোমন্থন করা কাজে এল। স্মৃতি কষ্টও কমে এল। ক্রমে ফেলে আসা সুখ স্মৃতি ফিকে হয়ে এল। এভাবে নতুন পরিস্থিতি সয়ে নিল।

তারপর নতুন দেশে নতুনত্বের স্বাদে বেশ কেটেছিল। মাঝে মাঝে দেশের চিঠি পেলে তার মনে জাগত শিহরন। উৎসাহ আর পুলকে অস্থির হয়ে উঠত। মা-বাবার কাছে চিঠি লিখে আনন্দ পেত। সে তো নিতান্ত বালক বয়সের ভাব। তারপর আস্তে আস্তে সে জোয়ারে ভাঁটা পড়ল। বাল্যস্মৃতিতে কালের প্রলেপ পড়ল। উৎপল কালের স্রোতে ভাসল।

আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব গেল ভুলে।

উৎপলও তাদের ভুলল। মনের পট থেকে চেনা চেনা মুখগুলো অস্পস্ট হল।

স্মৃতিচারণ করলেও পূর্ণ অবয়ব মনে পড়ল না। ক্রমে স্নেহের বন্ধন শিথিল হল। মা-বাবার স্মৃতি মনকে আর তেমন নাড়া দিল না। মা-বাবাও তাকে ভুলে গেল।

তাদেরই বা দোষ কি ?

চীনদেশে ছেলেরা পা বাড়াবার একটি বছর পর দু-দেশের মধ্যে কাঠ-ঠোকরা পাখির মত ঠোকাঠুকি আরম্ভ হল।

লাগল যুদ্ধ।

দু-দেশের সম্পর্ক হল সাপে নেউলে।

ডাক বিভাগে এল অচলাবস্থা। তাসখন্দের বোঝাপড়ায় যদিও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরল তথাপি চিঠি পত্রের যাওয়া আসায় বড্ড সময় লাগত। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উৎপল কালের স্রোতে ভাসল।

কিন্তু দাদা!

রক্ত মাংসের সম্বন্ধ—বড় ভাই। মরুভূমির মাঝে তৃষ্ণার আধার। তার থেকেও উৎপল পেল না আদর যত্ন, সুখ শান্তি। দাদার অবহেলায় তার সব সদিচ্ছা বড় হবার স্বপ্ন বলি হল। উৎপল দূরের হিতাকাঙ্খিদের কথা মনে পড়লে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়—

"দূর তো দূর চোখের দূর,

দূর তো দূর মনের দূর"।

অতীতের গর্ভে আর একটি বছর বিলীন হল।

এল শারদীয়া উৎসব। উৎপল বসে বসে ভাবছিল এমনই একটি শারদীয়া পূজোর কথা। দু'বছর পূর্বের এক শরৎ কালের কথা মনে পড়ল। সে স্মৃতি এখনও মনে পীড়া দেয়। সে সময় দোকানের কাজের চাপে উৎপল পরীক্ষা দিতে পারল না।

কিন্তু তারপর?

তারপরও দাদা ভাইয়ের ভাল-মন্দের কথা ভাবল না। সেদিনের কথা ভেবে এখনও কষ্ট পায়। সে সময় দাদা তার কোন অনুরোধই কানে নিল না। শহরে কোলাহলের মধ্যে থেকে তার পড়াশুনা শিকেয় উঠল। তার জন্য বার্ষিক পরীক্ষায় সে ফেল করল। সেই বেদনার কথা মনে পড়লে আজও কষ্ট পায়।

উদ্রপল লক্ষ্য করল দাদার এক ঘুয়েমি স্বভাব আজও কাটল না। আজও তার ভাল মন্দের কথা ভাবে না। ব্যবসার উন্নতি ছাড়া আর যেন কিছু ভাবতেই পারে না। উৎপল ভাবে সময় বয়ে গেলে তো আর ফেরে না। তাহলে যে দুটো বছর নষ্ট হল তার ক্ষতি পূরণ কে দেবে?

হ্যাঁ উৎপলের জীবনের অগ্রগতি দুটো বছরের জন্য নষ্ট হল। উন্নতির পথে পিছিয়ে গেল অনেক। কে বলতে পারে সে এ দুটো বছর এগিয়ে যেতে পারলে একটা স্থায়ী উন্নতি করতে পারত না!

যাইহোক উৎপল ভাবছিল পুরানো দিনের কথা। আর বর্তমানেই বা কিভাবে সংসারের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। এমন সময় সুনীতি ও দীপঙ্কর পূজোর জামা কাপড় নিয়ে ছুটে এল। তাকে জড়িয়ে ধরে বলল--দেখ কাকু আমাদেব পূজোর জামা কাপড়।

হঠাৎ পুকুরের নিশ্চল জলে টুপ করে ঢিল পড়লে যেমন জলের ঢেউ গুলো নেচে নেচে জলাশয়ের ঘুম ভাঙ্গানোর লক্ষণ দেখা যায় তেমনি উৎপলেরও চিন্তারাশির ব্যঘাত ঘটলে সময় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হুশ হল।

সঙ্গে সঙ্গে পড়ার বইটা হাতে নিয়ে মহেশবাবুদের বাড়ি এল। এখানে বলে রাখা দরকার ইতো মধ্যে মহিতোষ নতুন বাড়ি কিনেছে। কিন্তু বাড়িতে ঘরের অভাব থাকায় উৎপল দিদিদের বাড়িতেই পড়ে। কাছাকাছি বাড়ি কেনায় উৎপল আগের মতই দিদির বাড়ির সুযোগ সুবিধা নেয়।

মহিতোষ পরে যে বাড়িটি কেনে তাও পুরানো বাড়ি। একটি মাত্র থাকার ঘর। এতগুলো মানুষের বাসস্থান। তার উপর লোক লৌকিকতা। সুতরাং কাকলিরত গুঞ্জনধ্বনি এবং নানান ভঙ্গি মানুষের যাতায়াতের মধ্যে উৎপল নির্বিঘ্নে অধ্যয়ন করতে পারত না। বাইরের লোকজনের জন্য যত না অসুবিধা হত কানের কাছে সুরমার হৃদয়বিদারক এবং উত্তেজক কথাবার্তার জন্য ততোধিক অসুবিধা হত। এর উপর ছেলে মেয়েদের মল মূত্রের দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো দায় হত। সব মিলিয়ে নিজের বাড়িতে পড়াশুনার পরিবেশ ছিল না। সুতরাং উৎপল বকুলদের বাড়িতে পড়াশুনার জায়গা করে নিল।

সেদিন আর পড়াশুনায় মন বসল না। বাজারে গেল। সকাল সকাল বাড়ি ফিরল। ঘরের পাশে এসে শুনতে পেল কে যেন সুনীতিকে পড়াচ্ছে। তবে এ কণ্ঠ প্রফুল্লের নয়। এ সুর মিহি। শান্ত নম্র কণ্ঠ। উৎপল অবাক হল কেননা ইতোপূর্বে এমন কণ্ঠস্বর শোনেনি। এমন মেয়েলী কণ্ঠ তার কাছে নতুন পুলক সৃষ্টি করল। মনে মনে ভাবল হয় তো কেউ বেড়াতে এসেছে। নতুন আত্মীয়র সঙ্গে আলাপ করা যাবে। তাছাড়া খাওয়া দাওয়াও ভাল হবে। নতুন রূপরসের কথা ভাবতে ভাবতেই ঘরে ঢুকল।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়।

ঘরে ঢুকে দেখল ইনি পরিচিত কেউ নন। এক অপরিচিতা তরুণী। উৎপল থমকে দাঁড়াল। সে থমকে দাঁড়াল যেন অপূর্ব শোভা দেখল। আলাপ করে এমন রসময় দৃশ্যের ব্যাঘাত ঘটাতে ইচ্ছা হল না। প্রাণ ভরে দেখতে ইচ্ছা করল।

বিরল দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য যখন হল তবে কেন একটু ভুলের জন্য

সব মাটি করে দেয়! এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহলে উৎপল আর একটু ধৈর্য্য ধর। একটু পরে আলাপ কর। দাঁড়াও আর একটু দেখ। কি হল উৎপল?

হঠাৎ চুপিসারে সরে এলে কেন? হঠাৎ বুকটা এমন ধড়াস ধড়াস করছে কেন?

পাঠক আপনারা এমন ঘটনার সম্মুখীন হলে এভাবে পালিয়ে বাঁচতে চান কি? হঠাৎ এমন করে বুকটা ধড়াস ধড়াস করে কি?

ভয় পেয়ো না উৎপল, বৌদি পুকুর ঘাটে গেছে তোমায় দেখতে পায়নি। অহো! উৎপল হঠাৎ চুপিসারে ঘরে ঢুকে পড়েছিল এবং মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও ছিল। সে জন্য ভাবনায় পড়ল পাছে কেউ সন্দেহ করে! চুপিসারে যুবতীদের দেখা!

যে যাই বলুক উৎপল কিন্তু এমন একটা রসময় অবস্থা চুপিসারে পর্যবেক্ষণ করতে চাইল না। লজ্জা হল। তা হোক। উৎপল মশাই এতক্ষণ যে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলে কি দেখলে?

হুঁ। উৎপল দেখল তক্তপোষের উপর উপবিষ্ঠা এক তন্বী। বয়েস তার চৌদ্দ কি পনের। পরনে শাদা শাড়ী। শাড়ীর পাড় নিলোভ রংয়ের। ফরসা শরীরে এমন চওড়া পাড়ের শাড়ী ভালই মানিয়েছে। কানের দুল দুটি আরো সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

মাথায় একরাশ ঘনচুল দুটি বেণীতে বাঁধা। বেণী দুটো মাথার পিছনে দুলে দুলে বর্ধন করছে। গোল গাল মুখ। টানা টানা চোখ। সুন্দর তার দেহের গঠন। সুন্দর তার সবই সুন্দর। সুন্দরী যেমন লাবণ্যময়ী তেমনি তার সারা অঙ্গে যৌবনের ঢেউ খেলছে। দেখতে যেন সরস্বতীর বরকন্যা। কণ্ঠে যেন পঞ্চম সুর বাজছে।

এ পর্যন্ত দেখে উৎপল আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। চুম্বকের মত আকর্ষণ করল মেয়েটির রূপ লাবণ্য। যথেষ্ট সময় বয়ে গেল। তারপর তন্ময়তা ভাঙ্গলে অপ্রতিভ হল। নিজের আচরণে নিজেই লজ্জিত হল। এ জন্যই উৎপল চুপিসারে ঘর থেকে বেরিয়ে লজ্জার হাত থেকে বাঁচল।

তারপর উৎপল কি করল?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করল। কল্পনায় বাকী দৃশ্যগুলো ও যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। হ্যাঁ উৎপল দেখল --সুন্দরী ষোলকলায় পরিপূর্ণা। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন পৃথিবীর বুক জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করে সৌন্দর্য বাড়ায়, সুন্দরীর ঢল ঢলে যৌবনও তেমনি লাবণ্যতায় ভরে উঠেছে। তার অঙ্গের বাহার আকর্ষণীয়। লোভনীয়। কথাগুলো সূক্ষ্ম স্বরগ্রামের মত। যেন মধু। সুন্দরী কখনো শান্তভাবে কখনো মাথা নেড়ে শিষ্যাকে জ্ঞানদানে ব্রত হল। কিন্তু অধৈর্য্যা শিষ্যা সে শান্ত পরিবেশকে চাঞ্চল্য করে তুলছে।

তারপর ?

উৎপলের মুখমণ্ডল এমন বিকৃত হল কেন !

শিষ্যার চাঞ্চল্যে প্রিয়দর্শীনির ক্লেশ বোধ বিবেচনা করে উৎপলের ভারী দুঃখ হল। প্রাণে বাজল। এজন্য তার মুখ বিকৃত হল। তা হল, কিন্তু অপরিচিতার প্রতি উৎপলের উঠাৎ করুণা হল কেন ? ভাল লাগতেই স্নেহের উৎপত্তি হয় আর স্নেহের পাত্রের ভাল মন্দে মানুষের মন সাড়া দেয়। কিন্তু এখানে উৎপলের চোখে রং ধরেছে কি ? কেননা সুনীতিও তো তার স্নেহের পাত্র। —কারণ ভাইঝি !

কি হল উৎপল মশাই অকারণে পরের প্রতি এত স্নেহ, এত মায়া কেন।

উৎপল নিরুত্তর।

কেননা হৃদয়াবেগের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এবার সে অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হল। মনের জড়তা ও লজ্জাকে ঝেড়ে মুছে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করল। উৎপলের আগমণ সুন্দরী টের পের।

—আপনি কি সুনীতিকে পড়ান ?

—হ্যাঁ।

—কতদিন পড়াচ্ছেন ?

—দিন পাঁচেক হয় আসছি।

—ভাল, আপনার পরিচয়টা জানতে পারি ?

—আমার নাম সবিতা ঘোষ। দিদি ওকে পড়াত। দিদির বিয়ে হয়েছে তাই আমি আসছি।

—হ্যাঁ, ওর বিয়ের কথা শুনেছি। আচ্ছা, আপনি পড়ান।

উৎপল সরে পড়ল?

সুন্দরী অনূঢ়ার সঙ্গে আলাপ করে যাৎপরনাই খুশি হল এবং মনের সুখে কত কি ভাবতে লাগল। আর সবিতা! সেও খুশি। কিন্তু নারী লজ্জার জন্য মনে মনে ভাবল—ছি! অমন কথা মুখে আনলাম কেন? অপরিচিত লোক। না বললেই হত। আবার ভাবল—

যদি সত্যি কথা না বলতাম তাহলে কি বলতাম? যদি বলতাম দিদি এখানে নেই তাই আমি এলাম। ও বাবা! তবে হয়েছে আর কি! তিনি কোথায় গেলেন? কি জন্য গেলেন? হাজার কথার উত্তর দাও। কথা বলার সুযোগ পেলেই হলো। পুরুষ মানুষ তো! কথা বলার সুযোগ না দিলেও গায়ে পড়ে কথা বলবে। তার থেকে এই ভাল 'দিদির বিয়ে হয়েছে'। বিয়ে তো সবারই একদিন হয়।

কিন্তু তাতে কি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া গেল?

অপরিচিত পুরুষকে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারল সবিতা?

মনের কোনে কৌতূহল জাগল কেন? কেন জানতে ইচ্ছা করল ছেলেটি কে? কোন অধিকারে তাকে এত কথা জিজ্ঞেস করল?

শেষ পর্যন্ত সুনীতিকে জিজ্ঞেস করেই ফেলল।

—উনি কে বলতো?

—আমার কাকু।

—এ কয়দিন তো দেখিনি।

—কাকু পিসিমার বাড়িতে পড়েন তো তাই।

—আচ্ছা। তুমি পড়ো।

উৎপলের সঙ্গে কথা বলার পর সবিতার চাঞ্চল্যতা বেড়ে গেল। একাগ্রতায় ছেদ পড়ল। আঁটো সাটো হয়ে বসল। শাড়ি গোছানোর অছিলায় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা হচ্ছিল তাকে দেখতে পেল না।

কি হল সবিতা ?

তোমার আবার বুক ধড়াস ধড়াস করছে কেন ?

—এই রে! তবেই হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে এরকম উৎপলের বুকও ধড়াস ধড়াস করেছিল। তারপর শান্ত হল। পরে উৎপলের চোখে রং ধরেছিল।

—তোমারও কি তাই ?

তাহলে বলি 'মর'! সবিতা এবার তুমিও মর।

তারপর ?

হ্যাঁ সবিতার ভারী লজ্জা হল।

মনে মনে ভ্যাংচাল—ভারী ঢং, আপনি কি সুনীতিকে পড়ান ? কেন, বাপু দেখতেই তো পাচ্ছ।

তাহলে বলি ও সবিতা তোমার মনই বা এত চঞ্চল হল কেন ? না, সবিতা আর থাকতে পারল না। সে সুনীতিকে জিজ্ঞেস করল।

—তোমার কাকু কি সব সময় ওখানে থাকেন ?

—না, শুধু পড়ার সময়টা থাকেন। আমাদের আলাদা ঘর নেই তো!

—তাহলে এখন এলেন যে!

—এখন তো কাকু বাজার নিয়ে এসেছেন। বাজার রেখে আবার ও বাড়ি যাবেন।

—আচ্ছা তুমি জোরে জোরে পড়।

ছাত্রী পড়ায় মন দিল। দিদিমণি এ সুযোগে সজাগ দৃষ্টি দিয়ে চারদিক দেখল। কিন্তু যাকে খুঁজল তাকে দেখতে পেল না। সবিতা দেখল না জানল না। যদি রান্নাঘরে ঢুকে দেখত তবে মন চোরাকে দেখতে পেত। বেড়ার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে তাকেই দেখছে। আবার কেউ দেখবে এ-ভয়ে উৎকণ্ঠিত। এদিকে সবিতা উতলা ওদিকে সে মনচোরা।

"আহা!···

তরুণ-তরুণী আড়ালে আড়ালে মনে একি রসোদ্দাম বাড়ালে ?"

সবিতা আনমনা। ছাত্রী ভুল পড়ে আর দিদিমণিকে দেখে। কি

ভাবছিল সবিতা ?

ভাবছিল যুবকটির কথা। দেখতে না জানি কেমন ? যতক্ষণ সে কথা বলেছিল দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে। এজন্য দেখতে পেল না। ফিরে যাবার সময় চোখ তুলেছিল। যতটুকু দেখল, বুঝল যুবকটি স্বাস্থ্যবান, সুন্দর দেহের গঠন, শ্যাম বর্ণ। এর বেশি দেখার সুযোগ হল না। নিজের কথাগুলো ভেবেই জিব কামড়াল— এ্যাঁ মা কি যে বল্লাম ছি!

এমন ভাবে বল্লাম যেন আমার ইয়ে···।

ধ্যাৎ ছাই! কি যে ভাবি।

—তা সবিতা যতই ভাল মানুষ সাজতে চাও তোমার আর রেহাই নেই। কারণ তোমার মন মজেছে।

সুনীতির পড়া শেষ হল। সবিতা উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে সুরমাকে উদ্দেশ্য করে বলল।

—বৌদি আমি যাচ্ছি।

সুরমা ঘরে নেই। উৎপল জবাব দিল!

—বৌদি পুকুরে গেছেন।

সবিতা একবার রান্না ঘরের দিকে তাকাল। তারপর লজ্জাবতীর মত গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল পথ ধরে।

উৎপলের সারা শরীর আনন্দে নেচে উঠল। এখন যদি আরো দু'চারটে কথা বলা যায়! মনে মনে কথাটি জপ করতে ভাল লাগছে।

'আমার নাম সবিতা'।

আঃ! কি মিষ্টি- না-না মধু।

উৎপল যেন স্টেজে অভিনয় করে চলেছে। সুরমা জলের কলসীটা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—মধু পেলে কোথায় ঠাকুরপো ?

-- পাবো আর কোথায় ? কিনে আনবো ভাবছি।

—না, ঠাকুরপো কিনতে হবে না; ঐ দেখ পুকুর পাড়ে একটা মৌচাকে কত মধু!

—কি আশ্চর্য্য! আমি জানি না তো।

—তবে ঐ দেখ, শাড়ির আড়ালে কত মধু ঝরছে।

—এঁ্যা মা ও এদিকে দেখছে। ফাজলামির জায়গা পাওনা!

তিন জনের চোখো চোখি হওয়ায় উৎপল জিব কামড়াল। সবিতা গাছের আড়ালে সরে পড়ল। আর সুরমা নিজের কৃতিত্বে হেসে লুটোপুটি খেল। তারপর উৎপল স্নান করতে পুকুর পাড়ে এল।

আ!

কি সুন্দর মানায় সবিতাকে। তার হাঁটায় নেই কোন চঞ্চলতা। সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে গুটি গুটি চলছে। উৎপল ভারী খুশি হল। মনে মনে গর্বও হল।

—এমন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেও সুখ। বিনয়, ভদ্রতা, শিষ্ঠাচারে মেয়েটি যথেষ্ট গুণবতী।

উৎপল স্কুলে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলে। সবদিন একই জায়গায় বসে। দ্বিতলে একেবারে দক্ষিণ দিকের কামরা উৎপলদের ক্লাস রুম। উৎপল জানালার ধারেই বসে। স্কুলের সামনে বড় পুকুর। তারপর বাঁশ ঝাড়। ওধারে কেয়াফুলের বাগান। বাঁশ ঝাড়ের গুঞ্জন ধ্বনি কেয়া ফুলের মধু চয়ন উৎপলকে মথিত করে তোলে। তাই সে প্রতিদিন জানালার ধারে বসে। বাতাসের সঙ্গে জলের মাতামাতি তার কাছে অদৃশ্য সুন্দরের হোলি খেলা বলে মনে হয়।

ঘাটের নারীবৃন্দের কর্ম সঞ্চলতা তার মনে দূর জগতে কর্মের মধ্যে সংসার ধর্মে মতি নারীর রূপ ফুটে উঠে। প্রেমময় সংসারের মুগ্ধ ছবি ভেসে উঠে তার হৃদয়ের কোণে। মনে পড়ে মা ঠাকুরমার কথা। 'কুল লক্ষ্মীর সেবা ধর্ম'। সঙ্গে সঙ্গে নিকট জাতের অকর্মা নারীর বিশৃঙ্খল কাজের মধ্যে দায়ে পড়া কর্তব্য সারার রূপ ফুটে উঠে। এমনি করে তার মন ঘনীভূত হয় দূর অতীত আর নিকট অতীতের দ্বার প্রান্তে। অকারণে তাকে কখনো হর্ষ, কখনো বিমর্ষ দেখলে।

আবার ঘাটের ঘোমটা পরা বধূর রহস্য উদঘাটন করতে দমকা বাতাস যখন পৎ পৎ করে মাথার কাপড় দূরে নিক্ষেপ করে তখন স্বলজ্জ যুবতীর মুখ দেখে তার দিদির কথা মনে পড়ে।

উৎপল নারীজাতির মধ্যে যেমন কোমলমতি মাতৃ-হৃদয়ের সন্ধান

পেয়ে নারীকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করতে লিখেছে, জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর প্রসারিত হৃদয়ের ভালবাসা পেয়ে নারীকে আশ্রয় দাতা বলে জেনেছে তেমনি আপন বৌদির কুটিল ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে একই নারীকে বহুরূপে চিনেছে।

সংসারে নারীদের এত রূপ দেখে উৎপলের মনে একটি নতুন বেধোদয় সৃষ্টি হয়েছে। নিজের ভ্রাতৃ-জায়াকে বাদ দিলে সাধারণতঃ নারী জাতিকে সে সম্মানের চোখে দেখে। এজন্য নারীর মূল্যায়ন তার কাছে বয়স ব্যবহারের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ঠিক অকারণে তার মায়ের বয়সি মহিলাদের মাসীমা, খুড়িমা, জ্যাঠিমা ব'লে সম্বোধন করে। তার থেকে বয়স্ক অনূঢ়া নারীদের 'দিদি' এবং কম বয়সি বিবাহিতাদের 'বৌদি' সম্বোধনে সবার কাছে প্রিয় হয়। তার এই আত্মীয় সম্বোধনে নারীরাও সহজে তার আপন হয়ে যায়।

আজ তার মনে আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে। আপন পর সব সংসারেব নারীদের ভীষণ ভাল লাগছে। বিশেষতঃ আজ স্কুলে আসার আগে বৌদির ব্যবহারে সে খুব প্রীত হয়েছে। মনে মনে ভাবল 'বৌদি এত ভাল!' আজ সহজে সিদ্ধান্ত নিল বৌদি ভাল ঠিকই তবে সংসারের স্বার্থে বৌদির ব্যবহার মাঝে মাঝে অন্য রকম হয়ে যায়।

উৎপলের মন যেদিন খুব ভারাক্রান্ত থাকে কিংবা অনমনস্ক থাকে সেদিন ক্লাসের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি চলে যায় প্রকৃতির বুকে। সংসারের জটিল কুটিল হিসাব-নিকাষগুলো কষে এসময়। এজন্য দক্ষিণের জানালাটি তার খুব পছন্দ। বলতে গেলে দক্ষিণের এই জানালাটি তার বাঁধা-ধরা এবং প্রিয়। আজও তার প্রিয় জায়গাটিতে বসেছে। আজ তার মন আকাশেব মেঘের মত ভাসমান। আজকে অন্যমনস্কতা অন্যদিনের থেকে বেশি। কেননা রুলকল হয়ে গেল কিন্তু উৎপলের সাড়া পাওয়া গেল না। ভাগ্যিস বন্ধুর তাড়া খেয়ে স্বাভাবিক হল নইলে উৎপলের যে কি হত!

উৎপল কি ভাবছিল?

তবে কি তার হৃদয়পটে নতুন ছবি ভেসে উঠল। আজ সকাল

থেকে তার মন ভারি খুশি। এমন কি বৌদির উপরও আজ আর রাগ নেই। সমগ্র নারী জাতিকে তার ভাল লাগল। নারীর স্নেহ ভালবাসায় পুরুষরা কত সুখি! জ্ঞানীরা বলেন সংসার সুখি হয় রমণীর গুণে। বৌদির মমতা পেয়ে উৎপল আজ কত খুশি! দিনটি তার হাসি স্ফূর্তির মধ্যেই কাটল।

কিন্তু দিনান্তে উৎপল খেতে এসে দেখল বৌদি ঘুমোচ্ছেন।

উৎপল জাগাল। সুরমা সাড়া দিল না। বার কয়েক ডাকাডাকির পর হাত ধরে ডাকাডাকি করল।

সুরমা অসাড়ে রোগীর মত শুয়ে শুয়ে জবাব দিল। 'নিয়ে খাও'।

উৎপল ভাত বাড়তে গিয়ে অবাক হল ভাতের মধ্যে মাছ ভাজা। উৎপল মাছের লোভ সামলাতে পারল না। একটা মাছ খেয়ে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সুরমা আড়মোড়া খেতে খেতে রান্না ঘরে ঢুকল। উৎপল মনে মনে হাসল। লুকোচুরি ধরা পড়ে যাওয়ায় বৌদি অস্বস্তিতে পড়ে যাবে। মনে মনে ভাবল বৌদি এমন করে কেন? ছোট্ট সংসার। মাঝখানে সে থেকেও নেই। বৌদি যা দেয় তাইতো খায়। তবে আর আলাদা জায়গায় রাখা কেন? মনটা তার আজ এতই ভাল ছিল যে সে এজন্য কিছুই মনে করল না। ভাবল বৌদি নিশ্চয় ভাল। সকালে সবিতাকে নিয়ে কি সুন্দর রসিকতা কারছে।

কিন্তু সুরমা রান্না ঘরে ঢুকে তার মনোভাবটা উলটো পালটা করে দিল।

—একটু তর সইল না বুঝি! আমি আসতে না আসতে বসে গেলে। একা এত তরকারি নিলে আর সবাই খাবে কি?

সুরমা ধুমধাম পা ফেলে শোবার ঘরে গেল। এরকম মাঝে মাঝে ঘটে। কিন্তু রাত কাটতে না কাটতে আবহাওয়া পাল্টায়। উৎপলের মনে ঘটনাগুলো রেখাপাত করে। চাপা আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলে। তাই অনেকদিন মনে থাকে। বঞ্চনা আর উৎপীড়ন থেকে যে আঘাতে পায় তা সহজে ভোলার নয়। উৎপল মুখ খুলে প্রতিবাদও করতে পারে না। কেননা খাওয়া নিয়ে দুকথা হওয়া মানে লজ্জার

ব্যাপার। উৎপল তা বরদাস্ত করতে পারে না। তার ভদ্রতায় বাধে। সে সব বুঝেও না বোঝার ভান করে। আর এ সুযোগ সুরমা নেয়। উৎপল ঝগড়া কাজিয়া না করলেও মনে মনে দুঃখ পায়। মনের গ্লানি মনেই থাকে। মনের গ্লানি নিয়ে কি আর বৌদির সঙ্গে স্বাভাবিক হওয়া যায়! সুরমা রসিকতা করতে চাইলেও তার কুব্যবহার উৎপলের মনে প্রকট হয়ে উঠে। মোটের উপর সুরমার অনাদরই দেবর-বৌদির স্বাভাবিক সম্পর্কের অন্তরায়। ফলে বৌদি-দেওরের প্রাণ খোলা রঙ্গ রসিকতা খুব কমই হয়। তবু মাঝে মাঝে যেটুকু ঘটে তা সহজাত মনের প্রকাশ। অজান্তে ঘটে যায়।

আগের দিনে ভাল ও মন্দ ঘটনায় উৎপল বৌদির ব্যাপারে ধন্দে পড়ে গেল। পরদিন সে বাজার রেখে বকুলদের বাড়ি যাচ্ছিল। পথে সবিতার সঙ্গে দেখা হল। সূর্যবাবুদের পুকুর পাড়ে। উৎপল ইচ্ছা করেই বরাবরের পথ ছেড়ে পশ্চিম পাড় দিয়ে গেল।

সবিতাকে দেখতে পেয়ে একটা বুনো ফুল হাতে নিল। ফুল চক্রাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে সবিতার সুমুখে এসে পড়ল।

—এ ফুলের কি নাম জানেন?

—না, জানি না।

—সে কি কথা! মেয়েরাইতো ফুলের নাম বেশি জানে।

—তা হোক্ আমি ও ফুলের নাম জানি না।

—আমি জানি, বলবো!

—বলুন।

—ভালবাসা।

—সবিতা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে যায়।

—ছি! পথের লোকে ভাবছে কি?

সবিতার আকস্মিক উত্তেজনায় উৎপল বিচলিত হল। মনে মনে ভয় হল—বাড়িতে বলে দেবে নাতো। তখনকার মত তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। মীমাংসার জন্য কোন ভাষা ও খুঁজে পেল না।

এরূপ কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় সবিতা অনেক দূর চলে গেল।

কি করতে গিয়ে কি হয়ে গেল। ভালবাসা প্রকাশ করবার রীতি-নীতি উৎপল জানে না। ভালবাসা প্রকাশ করতে গিয়েই এমন হল। উৎপল কিছুক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। দুঃশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে সে পড়ার ঘরে ঢুকল। জীবনে প্রথম কোন মেয়েকে ভালবাসা। আর তা প্রকাশ করতে গিয়েই আশাহত হল। বুকে খুব বাজল। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। সবিতা যদি বাড়িতে বলে দেয় তাহলে কেলেঙ্কারীর দায়ে পড়বে। উৎপলকে সবাই ভাল ছেলে ব'লে জানে। শেষে ছি! ছি! পড়ে যাবে। এ ভয়ে সিটিয়ে গেল। কেমন একটা খেয়াল এবং অজানা টানে এমন একটা হাসি মস্করা করতে গিয়ে একটা অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হল। তাই মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারল না।

মনের অজান্তে কয়েকবার চেয়ারে বসল আবার উঠল। এ বই ও বইয়ের পাতা উল্টাল অথচ কোনটাতেই মন বসল না। খোলা মনের কপাট যেন বন্ধ হল। আহত সৈনিক অন্ধকারে যেমন ছটফট করে উৎপলের সে অবস্থা হল। যে অসুখের কথা কাউকে বলা যায় না হঠাৎ তার প্রতিকারও করা যায় না। তা ভাববার বিষয় বৈকি! হঠাৎ কেন জানি সবিতার উপর রাগ হল। সিদ্ধান্ত নিল যা হয় হবে সবিতার সঙ্গে আর কোন দিনই সে কথা বলবে না। সবিতার দিকে ফিরেও তাকাবে না। তারপর ভাবল তাইতো, সবিতার সঙ্গে কথা না বললে সে কি করে জানবে সবিতা কাউকে ও কথা বলেছে কিনা? তার চাইতে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে আর তখনই সবিতার মনের কথা বোঝা যাবে।

এরকম চিন্তা ভাবনা করেই উৎপল সূর্যবাবুদের পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়াল। কেননা কিছুক্ষণের মধ্যে সবিতারও পড়ানো শেষ হবে। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। সবিতা বকুলদের বাড়ির দিকে নজর রেখে এপথ ধরে এগিয়ে এল। সবিতাকে এগিয়ে আসতে দেখে উৎপলও এগিয়ে গেল যেন পথে হঠাৎ দেখা হল। উৎপল থমকে দাঁড়াল। সবিতাও অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেল। উৎপল মনে সাহস সঞ্চয়

করে বলল।

—দেখুন ও সময় যা ঘটল তার জন্য আমি দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না যেন।

—আমিও দুঃখিত। অমন করে বলেছি বলে কিছু মনে করবেন না।

সবিতা আর দাঁড়াল না। হন্ হন্ করে নিজের পথে এগিয়ে গেল। উৎপল আনন্দের আতিশয্যায় কোন কথাই বলতে পারল না। মনে মনে ভাবল সবিতা খুব ভাল মেয়ে। বাড়িতে নিশ্চয় কিছু বলেনি। যদি বলত তাহলে তার কথায় অন্য সুর থাকত। যদিও সবিতা দুঃখ প্রকাশ করেছে ভদ্রতার খাতিরে কিন্তু তার মনে করার মত কারণ ছিল। ঐ ফুলটির নাম যে 'ভালবাসা' নয় তাতো উৎপল জানে। উৎপল ফুলের আড়ালে অন্য কথা বলতে চেয়েছে তা সবিতা নিশ্চয় বুঝেছে। তাহলে সবিতা তাকে ভুল বোঝেনি। তবে কি সবিতা তার ইঙ্গিতে সায় দিয়েছে! সবিতার চলা দেখছে উৎপল। পথের মোড় বাঁক নিয়েছে বাম দিকে। সবিতা বামদিকে ঘোরার সময় উৎপলের দিকে তাকাল। দুজনের চোখো-চোখি হওয়ায় দুজনেই হেসে ফেলল।

তারপব সবিতা সূর্যবাবুদের বাড়ির আড়ালে পড়ে গেল। উৎপল খুশি মনে বাড়ি ফিরল।

পরদিনও দুজনের পুকুর পাড়ে দেখা হল।

এখন উৎপলের বাড়ি আসা আর সবিতার বাড়ি ফেরার সময় একই সূত্রে গাঁথা হয়ে গেল। কে যে তাদের হৃদয়ের কপাটে সময়ের ঘন্টি বাজায় তা তারাই জানে।

সময় যে হয়ে এল ঐ
আর কেন বসে রৈ?

অদ্ভুত টানে তারা সময়ের সাথে তালে তালে পা ফেলে চলে। এমনি করেই একটু হাসির ঝিলিক জিব ভ্যাংচি আর ফুল নাড়াচাড়ার ইঙ্গিতে এক গভীর একাত্মতার পথ খুঁজে পেল। একের প্রতি অপরের জানার আগ্রহ বাড়ল। হৃদয় মন্দিরে গড়ে তুলল ভালবাসার সোপান। এ ভালবাসা দেহে নয় প্রাণে। ব্যাপ্ত হল শোনিতে শোনিতে, প্রতি শিরা

উপশিরায়। তা প্রকাশিত হল উচ্ছ্বাসে নয় নাড়ীর টানে। জৈবিকতায় নয় প্রাণের বন্ধনে।

নব বসন্তের হাওয়া লেগেছে তাদের অঙ্গে। ছোট্ট চাহনি আর ঝিলিক মারা হাসিতে কত যে পরম সন্তোষ তা এ দুটি তরুণ তরুণি উপলব্ধি করতে পারে। যে কথায় জুড়ায় বুক সে কথাই তারা বলে। যে ইঙ্গিতে মনের সঙ্কির্ণতাকে দূর করে, মনকে পবিত্র করে সে রকম পথই তারা গ্রহণ করল। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসের জলহারা দিনে খাল বিলে পড়ল ভাঁটা আর সবিতা—উৎপলের প্রশস্ত বুকে এল ভালবাসার জোয়ার।

মাঠের সোনার ফসল দেখে কৃষকের মুখে হাসি ফুটল। তারা আঁটি আঁটি ধান নিয়ে বাড়ি ফিরছে। উৎপল—সবিতা ফসল টানার দৃশ্য দেখে মনে রঙ্গিন ছবি আঁকে। মাঠের জল প্রায় শুকিয়ে গেছে। চিরচিরে জলে পুঁটি মাছ দৌড়ায়। উৎপল মাছ ধরে ডাঙ্গায় ছুড়ে দেয়। সবিতা মাছ জড়ো করে। তরুন-তরুণী অথচ শিশুর মত মাছ ধরার খেলায় মেতেছে।

গাছের ছায়ায় হরিণ শাবক পাতা খায়।

সবিতা ধরতে যায় ধরতে পারে না। উৎপল ধাওয়া করে ধরে দেয়। সবিতা হরিণ শাবককে আদর করে। স্নিগ্ধ গ্রাম্য ছবির সৌন্দর্যের ন্যায় উৎপল সবিতার মন সুন্দরের প্রাণে বিকশিত হয়। তাদের সুশীতল ভালবাসা কেন্দ্রিভূত হয় একাত্মতায়।

দেখতে দেখতে কার্ত্তিক মাস শেষ। অগ্রহায়ণের শুরু। আর এক মাস পরেই উৎপলদের টেষ্ট পরীক্ষা হবে। অতএব উৎপল নিজের পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত। সবিতার সাথে দেখা সাক্ষাতে ভাঁটা পড়ল। ও পক্ষে সবিতা ও হাইস্কুলে পড়ে। ওদের সাংসারিক অবস্থা ভাল নয়।

অভাব অনটনের সংসার।

এজন্য সবিতা টিউশনি করে। আর এ উপলক্ষেই উৎপলের সংঙ্গে তার পরিচয়।

সবিতার ও সামনে নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা। টিউশনি ছাড়া অন্য দিকে নজর দেবার সময় নেই। স্বভাবতঃই উৎপল—সবিতার মধ্যে দীর্ঘ সময় পর দেখা হতে লাগল।

উৎপল সবিতার ভালবাসা যত গাঢ় হতে লাগল তত পরস্পর পরস্পরের ভালমন্দ সচেতন হয়ে উঠল। পাঠকবৃন্দ আমরাও আশা করি নিষ্ঠা সহকারে পড়াশুনা করে পাশ করুক। প্রাণ থাকলে তো প্রণয়। আর প্রাণ রাখতে গেলে নিজ কর্মের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুতরাং এসময় ওরা পরস্পর দূরে থেকে প্রণয়ের মর্যাদা বুঝুক। ইত্যবসরে আমরা মহিতোষের খোঁজ খবর নিই।

তার আগে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের যুবকদের হাল চাল নিয়ে আলোচনা করি। কেননা এ কাহিনীর প্রথমেই আমরা জেনেছি মহিতোষ স্থানীয় ক্লাবের সদস্য হয়েছে। মহিতোষের বন্ধু জুটেছে অনেক। এই বন্ধুরা বেশির ভাগ যুবক। এদের কথাতেই বাঙালী যুবকদের কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় বর্তমান যুবকরা হুজুক প্রিয়। খেলাধূলা, রাজনীতি, চলচ্চিত্র, মায় সামাজিক, অসামাজিক যে কোন বাগ বিতণ্ডায় বিশেষ পারদর্শী। একান্তরূপে আলোচনার কোন বিষয়বস্তু না থাকলে যুবকরা যুবতীদের দেহ সৌন্দর্য নিয়ে রসাল আলাপে মগ্ন হয়

মহিতোষের বন্ধুরা অনেকে সাকার আবার অনেকে বেকার। সাকার বন্ধুরা সারা সপ্তাহ নিজকর্মে ব্যস্ত থাকে। রবিবার এলে বন্ধুর দোকানে বসে গল্প গুজবে মেতে উঠে। আর বেকার বন্ধুদের তো কথাই নেই. সময়কে হত্যা করাই তাদের কাজ। যতক্ষণ ক্লাবে সময় কাটাল--ভাল। বাকি সময় বন্ধুর দোকানে বসেই আড্ডা মারে। এমনি করে মহিতোষকে ঘিরে মৌচাক গড়ে উঠেছে।

মহিতোষ পরম বন্ধু হিতৈষী।

বন্ধুদের প্রতি করুণার উদ্রেগ হয় তাই তাদের বিপদে টাকা পয়সা ধার দিয়ে সাহায্য করে। বন্ধুদের অনেকেই মহিতোষকে তোসামোদ

করে বিশেষ সুবিধা আদায় করে। বাঙালী চরিত্রের এই এক বিশেষ গুণ 'তোষামোদ' করা। যার যতক্ষণ আছে তাকে অসনে বসনে মাথায় তুলে রাখে; আর যখন তার তেল ফুরোয় তখন তাকে মাথা থেকে পায়ে ঠেলে। অর্থাৎ কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরোলে পাজি। এমন চরিত্রের মানুষ অভাব নেই।

মহিতোষদা এতদিন ভাল লোক ছিলেন। সকাল বিকাল চা পানির খরচ দরাজ হস্তে ব্যয় করতেন। কিন্তু ইদানিং শ্রীমানের আয় কমে যাওয়ায় তার শ্রীও কমে গেছে। মহিতোষ আর দাদার সম্মান পাওয়ার অধিকারী নই। কেননা মহিতোষরা আর চা পানির ব্যবস্থা করতে পারছেন না। সুতরাং এতদিনের পুরনো বন্ধুরা মহিতোষদাকে 'বাঙাল' বলে উপহাস করছে।

শেয়ালের শেষ সিদ্ধান্ত—আঙ্গুর ফল টক!

'বাঙাল' শব্দটি দ্বারা একজন মানুষকে নির্দেশ করা দোষের বিষয় নয়। যদি সে মানুষকে উপেক্ষা করা না হয়। অর্থাৎ বক্তা ও শ্রোতার আন্তরিকতার উপর প্রয়োগটির গুণাগুণ নির্ভর করে। পাঠক আপনার আদি নিবাস যদি পূর্ববঙ্গে হয় তাহলে ভেবে দেখুন আপনার পশ্চিমবঙ্গীয় কোন বন্ধু যদি বলেন—বাঙালদের রান্না বড় চমৎকার, খেলে ভোলা যায় না। রকমারি রান্না আর পরিবেশন ওরা জানে।

অথবা চলতে চলতে যদি শোনেন—বাঙালরা জীবন সম্বন্ধে বড় সচেতন, তারা খালি হাত-পা নিয়ে আসে আর পরিশ্রমের বলে বড় হয়। তখন আপনি নিশ্চয় খুশি হবেন।

আবার আপনি যদি পশ্চিমবঙ্গীয় কোন বন্ধুকে বলেন—ঘটিরা না জানিস খেতে না জানিস পরতে, সকাল হলে মাঠে যাস শৌচ কাজ সারতে।

এক্ষেত্রে আপনার বন্ধু কি বিরক্ত হবেন না? কিন্তু আপনি যদি বলেন, ঘটিদের দয়া মায়া আছে বলেই বাস্তুহারা মানুষগুলো ঠাঁই পেয়েছে। এবার আপনার বন্ধুর মন নিশ্চয় খুশিতে ভরে উঠবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙাল বা ঘটি শব্দগুলো কোন অর্থে ব্যবহৃত

হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে তাদের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ।

যাইহোক্ মহিতোষের সুখের দিনের বন্ধুরা তার অসময়ে খারাপ অর্থে বাঙাল শব্দটি ব্যবহার করত বলেই দুঃখ পেত।

পরস্পরকে সহযোগিতা করে না বলে বাঙালী জাতি ব্যবসা বাণিজ্য কলে কারখানা কোথাও উন্নতি করতে পারে না। অথচ মাড়োয়ারী গুজরাটিদের পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা, সহমর্মিতা, থাকার জন্য জীবনে দ্রুত উন্নতি করে। প্রতিবেশীর উন্নতি দেখলে বাঙালী ঈর্ষা করে। তাতে নিজের উন্নতি হয় না। প্রতিবেশীর উন্নতিতেও বাধা পড়ে।

আজকের বাক সর্বস্ব বাঙালী আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী নই বলে নতুন সৃষ্টির কথা না ভেবে পূর্বপুরুষদের অর্জিত শক্তি বিকিয়ে গর্ববোধ করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত মনীষীদের নাম ভাঙ্গিয়ে আর কতকাল চলবে!

অতএব ঘটি-বাটির ঋন ঝনানি ছেড়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশই বাঙালীর উন্নতির সোপান হতে পারে।

কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। প্রযোজ্য বাক্যটি থেকে উচিত শিক্ষা আমরা নিতে পারবো?

অকৃতজ্ঞ বন্ধুগণ যখন মহিতোষ থেকে অধিক উপকার পেল না তখন অতীতের কথা ভুলে গেল। এতদিনে তাদের স্বরূপ মুখোশের আড়ালে ছিল। এখন একে একে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তারা মহিতোষকে আর তোয়াক্কা করে না। বরং তার দোকানে বসে খোস মেজাজে পরনিন্দা পরচর্চা করতে লাগল।

কখনো দোকানের সামনে বসে পথের মেয়েদের প্রতি অশালীন ইঙ্গিত করতে লাগল। মহিলা খরিদ্দারগণ দোকানের সামনে গেঞ্জাম দেখে অন্যত্র সরে পড়ত। এভাবে খদ্দের ভাঙ্গল। ওরা এভাবে বন্ধুর প্রতি কর্তব্য সমাধান করল। স্বাভাবিক কারণে বন্ধুতে বন্ধুতে মনমালিন্য হল। ঈর্ষান্বিত বন্ধুগণ তলে তলে পাশের দোকানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মহিতোষের ক্ষতি সাধনে ব্রতী হল। ফলে প্রায়ই কোন ছল-চাতুরিতে ঝামেলা লেগেই থাকত।

এমনি উত্তেজনার মধ্যে উৎপলের টেষ্ট পরীক্ষা হল। উৎপল এতদিন দাদার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার রক্ষার্থে সংগ্রাম করেছিল। কিন্তু সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এসে পড়ায় সময়ের প্রয়োজন বোধ করল। কিন্তু এ পর্যন্ত মহিতোষ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাকে অবহেলা করে এসেছে। এখন কি উপায় ?

উৎপল উপায় ঠিক করল দোকানের কাজের ফাঁকে পড়াশুনা করতে হবে। সম্পত্তি রক্ষার্থে মহিতোষ মামলায় জড়িয়ে পড়ল। তার সময় ব্যয় হতে লাগল কোর্ট কাছারীর পিছনে ছুটতে গিয়ে। ফলে উৎপলের উপর দোকানের দায়িত্ব আরো বেশি করে পড়ল। এত করেও উৎপল যে আর শেষ রক্ষা করতে পারছে না।!

দাদার একি হল !

মাথার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যেতে না যেতে দাদার ঘাড়ে রাজনীতির ভূত চাপল ?

উৎপল উৎকণ্ঠিত হল। আসলে মহিতোষের শত্রু বাড়ায় সে রাজনীতিব আশ্রয় নিল। দেশে অর্থনৈতিক সংকট যত বাড়তে লাগল মানুষে মানুষে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তত বাড়তে লাগল। ফলে কোর্ট কাছারী এবং রাজনীতির আশ্রয় নিয়ে মানুষ নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করছে। এটাই আজকের সমাজের বাস্তব চিত্র। স্বাধীনতার প্রাক্কালে মানুষ দেশ স্বাধীন করার জন্য একটা রাজনীতিব আশ্রয়ে ছিল। কেননা তখন সবার স্বার্থ ছিল এক—স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে মানুষ স্বার্থের কারণে বিভিন্ন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে লাগল। আদর্শ সামনে থাকলেও ব্যক্তি স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দিল।

স্বাভাবিক কারণে রাজনৈতিক দলাদলি যত বাড়ছে দেশে হানাহানিও তত বাড়ছে। বাড়ছে অস্থিরতা।

যুগযন্ত্রণা ছাত্র সমাজের ঘাড়েও চাপছে। উৎপল একজন ছাত্র। মধ্যবিত্ত সমাজের এক সদস্য। বাঙালী সমাজের সামগ্রিক চালচিত্রের সঙ্গে সেও জড়িয়ে আছে। এখন সবার লক্ষ্য এক। বেঁচে থাকার সংগ্রাম। স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম। ছাত্ররা ভাবে কলেজ কিংবা

বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ মাড়ালেই চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল। ফলে শিক্ষার মাপকাঠি থেকে ডিগ্রীর মাপকাঠি ছাত্রদের আইডেনটিটি হয়ে দাঁড়াল। তাই যদি হল অত খাটাখাটনির দরকার কি? টুকে পাশ করলেই পাশ। শিক্ষা কত খানি হল। তাতে দেশ কতখানি উপকৃত হল তা দেখছে কে! চাইতো সার্টিফিকেট। পাশের সার্টিফিকেট। তাহলেই এমপ্লয়মেণ্ট অফিসে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। চাকরির জন্য ধর্ণা দেওয়া যাবে। সুতরাং চারদিকে চলছে পাশের প্রতিযোগিতা।

উৎপল ভাবনায় পড়ে গেল এই প্রতিযোগিতায় সে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবে কিনা! কেননা যারা টোকাটুকি করে তারা বড় জোর পাশ করে। কিন্তু ভাল রেজাল্ট করতে গেলে অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে। উৎপলের সহজে পাশ করার বিদ্যাও নেই। সুতরাং তাকে খাটতে হচ্ছে দিনরাত। দিনে দোকানদারি, রাতে পড়াশোনা।

যতদিন যায় উৎপল ভাবে দাদা ইচ্ছা করলে তাকে পড়াশুনার সুযোগ করে দিতে পারে। আসলে দাদার সে ইচ্ছাই নেই। দাদা চায়না সে পড়াশুনা করে চাকরি বাকরি করুক। তাহলে দাদার দোকান এবং সংসার দেখবে কে? এভাবে সে মহিতোষকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করল। সুতরাং দাদার প্রতি ভাইয়ের শ্রদ্ধা ভক্তিতে ভাটা পড়ল। কর্তব্যের মধ্যেই পরমাত্মীয়ের আসল রূপ ফুঁটে উঠে। ভালবাসা, শ্রদ্ধা, পারিবারিক সুখ, পারস্পারিক কর্তব্যের উপর নির্ভর করে।

পরিতোষবাবু মহিতোষের একজন শুভাথী।

তিনি উৎপলের দুঃখের কথা মন দিয়ে শুনলেন। মহিতোষের রাজনীতি নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা তিনিও পছন্দ করলেন না। তিনি মহিতোষকে বোঝালেন, উৎপলকে অন্ততঃ একমাসের জন্য নিরিবিলি পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া হোক। পরিতোষবাবুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় মহিতোষ ভাইকে একমাসের জন্য নিরিবিলি পড়াশুনা করার সুযোগ দিল।

পৌষের ধান্যসম্ভার।

ঘরে ঘরে নতুন ধান উঠছে। পৌষ পার্বণে বাঙালীর ভুরি ভোজন। এ সময় বাঙালীর ঘরে ঘরে পিঠা, মিষ্টান্ন এবং রকমারি খাবারের ধুম পড়ে যায়। পৌষ-পিঠা খেতে এ যায় ওর বাড়ি ও আসে এর বাড়ি। এমনি করে বাঙালী হিন্দু সমাজে আনন্দে কথাটা দিন বেশ কেটে যায়। মহিতোষদের সংসারেও পৌষ-পার্বণের ধুম পড়ে গেছে। প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজন এসে পৌষ-পিঠা খেয়ে গেছে। অন্যদিনের মত উৎপল তার ঘরে বসে পড়াশুনা করছে। মহিতোষ টিফিন সেরে বাহিরে বের হল। তার কিছুক্ষণ পরে সবিতা এসে হাজির হল।

—আরে, কি সৌভাগ্য! এ সাত সকালে মনে পড়ল বুঝি!

—কি করব বৌদি পরীক্ষা হওয়ার পর একটুও আসার সময় পাইনি। পরীক্ষার শেষ দিন মামা এসেছিলেন। সেই যে মামাবাড়ি গিয়েছি আর কাল বিকালে ফিরলাম।

—বেশ করেছ। তা পরীক্ষা কি রকম হল?

—ভাল, দশম শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছি।

প্রথম হয়েছি।

—বা! লক্ষ্মী মেয়েতো!

—বৌদি আমার ছাত্রী কৈ?

—এই এক্ষুনি পিসীর বাড়ি গেছে।

তুমি ভাই বস আর এ পিঠাগুলো খাও। আমি এক্ষুনি পুকুর ঘাট থেকে আসছি।

—বেশ এসো; আমি ততক্ষণে উৎপলদার সঙ্গে গল্প করি।

উৎপল এতক্ষণ সবই শুনতে পেল। বৌদিকে পুকুর ঘাট যেতে দেখে এবার সবিতার আসার সময় হয়েছে বুঝল। তাই মনোযোগ সহকারে বই পড়ার ভান করল।

সবিতা এসে কিছুক্ষণ পাশে দাঁড়াল।

উৎপলের নজর পড়ছে না দেখে খিল খিল করে হাসল।

—আরে! তুমি এলে কখন?

—বা আমি এসে বৌদির সঙ্গে গল্প করলাম। তারপর এখানে এসে দাঁড়ালাম। এসব কিছু জান না বুঝি!

- কি করে জানবো বল, মনযোগ সহকারে পড়ছিলাম যে!

---হ্যাঁ মশাই মনযোগ না ছাই! ইস্‌···দেখি···দেখি, ওটা কি?

—আঃ! দুষ্টুমি করছ কেন?

—এ্যা মা···ফটোটা কোথায় পেলে?

আমি কত খুঁজেছি ওটা পাইনি।

—তোমার মনে আছে নিশ্চয়; আমার টেষ্ট পরীক্ষার আগে অংক কষতে এসেছিলে তখন তোমার বইতে পেয়েছি।

—তাই বলে অপরের জিনিস না বলে নিতে আছে বুঝি!···ওটা ফেরত দাও।

—আহা! একেবারে কচি খুকি।

ফটোটা আমাকে দেওয়ার ইচ্ছা না থাকলে বইতে রাখতে নাকি?

—এ্যা মা, কি দুষ্টু কথা। আমি এক্ষুনি চলে যাব।

—থাক অত রাগ করতে হবে না; লক্ষ্মী মেয়ে পিঠেগুলো এনেছ খাও।

—না, আগে তুমি খাও তবে আমি খাবো।

—বেশ, তাই নিলাম।

তা সত্ত্বেও সবিতা খাচ্ছে না দেখে উৎপল বলল:

---কৈ খেলে না যে!

—তুমি না দিলে আমি খাব কেন।

সবিতা পিঠে খাওয়ার জন্য উৎপলের আরো কাছে এল। উৎপল হাতের পিঠা থেকে কিয়দংশ ভেঙ্গে সবিতার মুখে দিতে গিয়ে সবিতাকে কোলে জড়িয়ে ধরে চুমা চুমায় ভরিয়ে দিল।

—ধ্যাৎ বৌদি আসছে।

সবিতা হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। উৎপলকে অধিক দুষ্টুমি করার সুযোগ না দিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে গেল। ততক্ষণে ঘাট থেকে সুরমাও ফিরল। বৌদির সঙ্গে গল্প করে সবিতা বাড়ি ফিরল। যাবার আগে

উৎপলকে ওদের বাড়ি যেতে নিমন্ত্রণ করল।

উৎপল একা ঘরে বসে রইল।

কিন্তু তার চঞ্চলতা বেড়ে গেল। সারা শরীর রোমাঞ্চিত হল। একটু আগে কি ঘটনাই না ঘটল!

ফটো নেওয়ার অছিলায় হাতাহাতি করতে গিয়ে তার হাতের কব্জি সবিতার বুকে লেগেছিল। নরম মাংসপিণ্ডের মধ্যে হাত পড়ায় সে যেন শক খেল। তারপর তার সারা শরীরে উথালি পাতালি শুরু হল।

সবিতার শরীরেও নিশ্চয় সে রকম কিছু একটা হয়েছিল না হলে পিঠে খাওয়ার অজুহাতে তার গায়ের কাছে এসেছিল কেন? ওতো কখনো অমন আদিখ্যেতা করেনি। উৎপল স্থান কাল সব ভুলে গেল। সবিতাকে সোহাগে ভরিয়ে দিল। রাঙ্গিয়ে দিল তার মন।

এখন সে কথাগুলো মনে পড়ায় স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠল। শিরা শিরায় জাগল কামনা। হ্যাঁ ঐ মাংসপিণ্ডদ্বয়কে ঘিরে আদিমতা জেগে উঠে। সে সব কথা ভাবতে ভাবতে উৎপল লজ্জিত হল। সময় মত সবিতা রান্নাঘরে না গেলে কি বাড়াবাড়িই না হত! উৎপল ভাবনায় পড়ল—সবিতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা উচিত কিনা?

পরীক্ষার আগে মনের অস্থিরতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল। একবার ভাবল যাবে না। গেলে আবার কি অঘটন ঘটে! পরক্ষণে ভাবল পিঠে খাওয়ার সুযোগে সবিতাদের বাড়ির পথ পরিষ্কার হওয়াই ভাল। কেননা সে আর সবিতাকে ছাড়া থাকতে পারবে না।

উৎপল নিমন্ত্রণ রক্ষা করল।

তার ব্যবহারে সবিতার মা বাবা খুব খুশি হল। সময় পেলে উৎপল যেন তাদের বাড়িতে যায় সে নিমন্ত্রণও তারা করল।

পারিবারিক ক্ষেত্রে উৎপল আর এক সমস্যার সম্মুখীন হল! উৎপলের পড়ার জন্য থাকার ঘরের লাগোয়া একচালা ঘর করা হয়েছিল। সেই ঘরে নতুন অতিথি এসে পড়ায় উৎপলের পড়াশুনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হল।

একটা পাটনাই গরু কেনা হল।

মহিতোষ গরু কেনার আগে তার থাকার জায়গার কথা ভাবল না।

পররাজ্যের আত্মীয়কে একটু বেশী খাতির করতে হল। সুতরাং উৎপলের পড়ার ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা হল। কেননা গরুর শিক্ষার প্রয়োজন। বাংলার আদপ কায়দা শেখার প্রয়োজন।

পাটনার শুকনো খাদ্যে পালিত গরু বাংলার সবুজ খাদ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে ভূগোলে জ্ঞান থাকার দরকার বৈকি!

গরুটির নাম রাখা হল ধবলী।

ধবলী যেমন তেমন নয়। ইতর প্রাণী বললে ভুল হবে। মেধাবী ছাত্রী। অল্প সময়ে অনেক কিছু হজম করতে পারে। ধবলী যেদিন ঘরে ঢুকল সে রাতেই উৎপলের দুখানি মূল্যবান বই হজম করে নিল। ছাত্রীর পড়াশুনায় নিষ্ঠা দেখে উৎপল অবাক হল।

সত্যিই ধবলীর শিক্ষা বাড়ল।

কেননা সে রাতেই গুরুর মস্তোকপরি গুরুদক্ষিণা (গোবর) দিল।

দক্ষিণা মন্দ নয়।

শিক্ষকমশাই ছাত্রীর উন্নতি দেখে এবং উপযুক্ত দক্ষিণা পেয়ে, ছাত্রীকে ঘরখানা উপহার দিল। সুতরাং শিক্ষক মহাশয়কে নতুন স্থান খুজতে হল।

উৎপল আবার বকুলদের বাড়িতে আস্তানা জোগাড় করল। উৎপল রাতে দোকানে থাকত। সকালে বাজার নিয়ে এসে দেখতে পেত বৌদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে টিফিনের কাজ সেরে ফেলেছে। উৎপল টিফিনের অপেক্ষায় থাকত। এমন সময় সুরমা ঘ্যান ঘ্যান করে বলত— ঘরে চিড়ে মুড়ি নেই আমি আর কি দেব! উৎপল জানত এবং এরকম উত্তরের প্রত্যাশাই করত। তারপর আস্তে আস্তে বকুলদের বাড়ি যেত।

উৎপল বকুলকে বলত—দিদি খেতে দে

বকুল বুঝত। উৎপল ঘরে বসে খাবার খেত ততক্ষণে বকুল রান্না ঘরে বসে কাঁদত।

—হায় বিধাতা, ভাইটির কপালে বুঝি এমনই ছিল!

এই একটি জায়গা যেখানে উৎপল আদর যত্ন পেত। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে দুটো কথা বলত। নারী জাতির স্নেহ মমতা কোমল

প্রাণের স্পর্শ এখানে এলেই অনুভব করত। তাই উৎপল সময় অসময়ে ছুটে আসত দিদির কাছে।

মহিতোষ এসব জানত না।

ভাবত ভাই বাড়িতে টিফিন করেই বোনের বাড়িতে যায়। সুরমা উল্টো কথা বলে কান ভরাত। সেই দুপুরের আগে খাওয়া জুটত না। সুতরাং দিদির ঘরে এগারটার আগে অল্প করে দুটো ভাতও খেয়ে নিত। সুরমা সবই জানত। আর ঈর্ষায় জ্বলত। স্বামীকে বোঝাতো—দেখ ঘরের খেয়ে বাইরে থাকা ভাল না। যত নষ্টের মুল তোমার বোনটি। আস্কারা দিয়ে ছেলেটার সর্বনাশ করলে। এখানে খেয়ে ওখানে বদনাম করবে!

সময় মত ব্যবস্থা করা না হয় পরে তোমাকেই তোয়াক্কা করবে না।

মহিতোষ ভুল বুঝল।

স্বভাবতঃই ভাইয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাল। ভুল বুঝল বোন-ভগ্নী-পতিকেও। কেননা বোন-ভগ্নীপতির কুপরামর্শে ভাই চলে! এভাবে শান্তির নীড় অশান্তিতে ভরে গেল।

সকালে সবিতা নিজের পড়াশুনা করত।

স্কুল থেকে বিকেল বেলা টিউশনি করত। মাঘ মাসের দিন। বেলা ছোট। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সূর্যিঠাকুর অস্তাচলে যায়। ছুটির দিন আগে আসত এবং বেলা থাকতেই ফিরে যেত। যে দিন রাত হয়ে যেত সেদিন উৎপল তাকে বাড়ি পৌঁছে দিত।

যাতায়াতের পথেই ওদের ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা হত। সুখ দুঃখের কথা হত। প্রেমালাপ হত। দুজনের বোঝাপড়া গভীর থেকে গভীর হত। এভাবে মনের অজ্ঞাতে দুটি হৃদয় একাকার হয়ে গেল। দুজনেই উন্মুখ হয়ে থাকত কখন দেখা হয়। এমনি করে চলতে চলতে সবিতা কয়েক-দিন উৎপলের অপেক্ষা করল না। ভাবল এভাবে উৎপলদার পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে।

হিতে বিপরীত হল।

অজানা আশঙ্কায় উৎপলের ভাবনা আরো বেড়ে গেল। চার পাঁচ

দিনের মাথায় এক বিকেলে উৎপল খেলতে বের হল। এমন সময় দূর থেকে সবিতাকে দেখল। দেখে আশ্বস্ত হল। না, সবিতার অসুখ করেনি। ভালই আছে।

উৎপলের মাথায় এক নতুন খেয়াল চাপল। বাগানের মধ্যে ঢুকল। আড়ালে বসে মৃদু-স্বরে গান ধরল। মনের মাধুরি মেশানো গান।

বল প্রিয়া বল মোরে
কেন থাকো দূরে দূরে···
মধু যামিনী বিরহে কাটে
যন্ত্রণায় পরাণ ফাটে ;
শীত যায় বসন্ত আসে
বনে বনে ফুল হাসে
তবু মন-উদ্যানে ফোটে না ফুল
ভাঙ্গে না মনের ভুল।

একি হায় ! পরাণ চায়
শুধু তোমায়···শুধু তোমায় ··
এসো সখি বসন্ত হয়ে মনের মাঝারে
হাত ধরে চলো ভাসি প্রেম সাগরে ॥

এতক্ষণ আনমনা হয়ে আসছিল সবিতা। হঠাৎ বিরহের গান শুনে থমকে দাঁড়াল। কোনখান থেকে এ গান ভেসে আসছে তা বোঝার চেষ্টা করল। গান শুনে প্রথমে খুশি হল। ভাবল উৎপলদা এ গান গাইছে। তারপর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ভয়ে গা ছম ছম করে উঠল।

তাইতো, ভূতুড়ে ব্যাপার নয়তো !

পথে লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। সবিতা দ্রুত পা চালাল। এমন সময় উৎপল ডাকল ··সবি···। পিছন ফিরে তাকাল সবিতা। তাইতো ! ঐ তো উৎপলদা।

সবিতা এগিয়ে এসে বলল—প্রিয় ভূত মশাই আড়ালে বসেতো বিরহের গান গাইলে। এখন একটা বিরহের গান শোনাও দেখি !

—আমি কোন কথা বলব না।

—এইতো বললে।

—আমি রাগ করেছি।

—তবে আমি চল্‌লুম।

—এই শোন, তুমি বুঝি আমায় ভুলে গেলে?

—এ রাম!

এ কয়দিন দেখা হয়নি বলেই বুঝি ভোলা হল।

—ভোলা নয়ত কি!

—তবে এই নাও, ফুলটা দেখো আর আমায় মনে করো।

উৎপল ফুল নিয়ে ছুটে গেল মাঠের দিকে। খেলার সাথীরা নিশ্চয় অপেক্ষা করছে।

শীতের তীব্রতা কমেছে।

বসন্তের আগমনে চারদিকে গাছপালা, পত্র পুষ্পের পরিবর্তন হল। কোকিলের কুহুধ্বনি, বসন্তের আগমনা বন্ধনা করল। গাছে গাছে কচি পাতার চাকচিক্কনতা সবুজের মনকে দোলা দেয়। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছোট্ট পাখির-কিচির মিচির গান কী মধুর লাগে! তাদের মনেও বুঝি বসন্তের হাওয়া লেগেছে।

বসন্তে যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপচিয়ে পড়ে তেমনি সবিতার দেহেরও সৌন্দয্য উপচিয়ে পড়ছে। সবিতা আনমনা।

বসন্ত এসে তার কানে কানে কি যেন বলে গেল। বনের ভ্রমরা ভোঁ ভোঁ করে যেন তারই পুনরাবৃত্তি করল। ছোট্ট পাখি চন্দনা সবিতার নতুন জীবনের নতুন গান গেয়ে শোনাল। বিকেল বেলা মৃদুমন্দ হাওয়ায় বাগানে বসে বসে সবিতা তারই ইঙ্গিত পেল।

প্রকৃতি মানুষের মনের উপর কত যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তা যিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক রাখেন তিনিই ভাল বুঝতে পারেন। প্রকৃতি প্রেমিককে দেয় আনন্দ। মুমূর্ষকে দেয় বাঁচার প্রেরণা। কবিকে দেয় মন ভোলানো রূপ। জ্যোৎস্না রাত অতুলনীয়। হ্যাঁ। এমনি এক জ্যোৎস্না রাতে কোকিলের কুহু-কুহু রবে সবিতার মনের

আগুন দ্বিগুন বাড়ল। বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে তার গায়ে। প্রাণে জেগেছে নতুন জীবনের ঢেউ।

সবিতা নিজেকে বিশ্বাস করতে পারে না কোন মুহূর্তে সে উৎপলকে এত ভালবেসেছে! কখন সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। আর ঠিক সে মুহূর্তে বসন্তের মাতামাতিকে উপেক্ষা করে উৎপল সরস্বতীর বাণী প্রাঙ্গনে বসে বসে অধ্যয়ন করে চলেছে। উৎপলের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এ কয়দিন সবিতা আপন মনে উৎপলকে নিয়ে কত স্বপ্নের জাল বুনল। তার যৌবন রূপ রং সবই উৎপলের জন্য বিলাতে চায়। ভক্তের মত সবিতাও নিজেকে উৎপলের কাছে উৎসর্গ করে মাগতে চায় —তোমার মনের মত করে নাও গো আমায়!

হ্যাঁ নিজের জ্বালায় জ্বলছিল সবিতা। কিন্তু পরীক্ষার সময় বলে উৎপলের সঙ্গে দেখা করল না। চৈত্রের প্রথমার্ধে উৎপলদের পরীক্ষা শেষ হল। পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই হল। তবু শেষ দুদিন মাথা যন্ত্রণার জন্য পরীক্ষা ভাল হল না।

জ্যোৎস্না ভরা রাত।

উৎপল পুকুরের সোপানে বসে পরীক্ষার কথাই ভাবছিল। এমন সময় দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হতে এক দমকা হাওয়া ফুলের সুগন্ধ নিয়ে ছুটে এল। উৎপলের মন প্রাণ আনন্দে ভরে উঠল।

আ! কী মিষ্টি বসন্তের বাতাস।

পাশের আম গাছ থেকে একটি অজানা পাখি নিজের ভাষায় উৎপলের নব যৌবনের জয়গান গেয়ে গেল। উৎপলের চিন্তা এলো মেলো হয়ে গেল। বাশিকৃত ভাবনার মধ্যে সবিতার কথাই উজ্জ্বল হয়ে মনের পর্দায় ভাসল।

মনে পড়ল টেষ্ট পরীক্ষার পরদিন সবিতা বলেছিল—উৎপলদা পরীক্ষা ভাল হওয়া চাই। তখন মনে হয়েছিল কথার পিঠে কথা। এখন মনে হচ্ছে: উৎপলের ভাল মন্দ সবিতারই মনের প্রতিচ্ছবি। অনেক আশা করেই বলেছিল সে—পরীক্ষা ভাল হওয়া চাই।

উৎপল কি অত ছাই পাস ভেবেছে!

আঃ! তারই বা দোষ কি!

পরীক্ষার সময় রাত জেগে পড়লে মাথা যন্ত্রণা করবে সে কী জানত? জানলেই বা কি করবে? বছরের পর বছর পড়ার সুযোগ পেল না। এখন শরীরের দিকে দেখলে চলবে না। কি দুঃখের কথা সবিতার মনোমত পরীক্ষা হল না। উৎপল এজন্য কত আক্ষেপ করল!

এ জ্যোৎস্না ভরা রাতে সবিতার কথা তার মনকে বার বার দোলা দিল। কত রঙ্গীন স্বপ্ন আঁকল কবিতাকে কেন্দ্র করে। দেখতে দেখতে রাত অনেক হল। নীল আকাশের তারাগুলি কত উৎপল সবিতার কান্না-হাসির নীরব সাক্ষী হয়ে চিরদিন মিট-মিট করে জ্বলে।

উৎপল বই পড়ে জেনেছে আকাশের এই যে অসংখ্য তারা গ্রহ নক্ষত্র এরা সবাই স্ব-স্ব গতিপথ রচনা করে চলে। কখনো তাদের গতি ভঙ্গ হয় না। দূরে দূরে থেকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ সূত্রে মহাকর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্যই তারারা এত সুশৃঙ্খল। উৎপল আকাশের তারাদের কথা ভাবতে ভাবতে নিজেদের জীবন যাত্রার কথাও ভাবল।

তারাও হাসি-কান্না স্নেহের টান, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের মধ্যে প্রীতির সূত্রে প্রেমকে সৃষ্টি করেছে। অতএব তারাও সুখী! তার ধ্রুব বিশ্বাস চন্দ্র সূর্যের মত তাদের প্রেমও ধ্রুব সত্য। কিন্তু সবিতার সঙ্গে দেখা করার সময় হচ্ছে না। দুপুরে দোকান থেকে ফিরে দুটো খেয়ে ফের বিকেলে দোকান। এমনি করে তিন চারদিন কাটল। উৎপল কোন মতেই সবিতার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেল না। পঞ্চম দিন একটা সুযোগ পেল।

ভাল মাছ পেয়ে মহিতোষ একটা মাছ কিনে উৎপলকে দিয়ে বাড়ি পাঠাল। আমবাগানের সরু পথে দেখা হল সবিতার সঙ্গে। সবিতা শোকে ম্রিয়মান। উৎপলকে দেখেও দেখল না। না দেখার ভান করে সবিতা নিজের পথে গুটি-গুটি এগিয়ে গেল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে উৎপল ডাকল—স··বি···তা। কাতর আহ্বান শুনে সবিতা ফিরে দাঁড়াল। সবিতা মৃদু হেসে বলল।

—উৎপলদা তুমি এত নিষ্ঠুর হবে আমি ভাবতেও পারিনি।

—আমি নিষ্ঠুর নই সবিতা।

সত্যি করে বলছি পরীক্ষার পর থেকে দাদার চোখা-চোখি ছিলুম। আসার যো পাইনি।

ওদের কথোপকথনের সময় দেখা গেল গাছের ডালে দুটো পাখি নিজের ভাষায় কিচির-মিচির কথা বলছে। সবিতা জিজ্ঞেস করল।

—ও দুটো পাখির নাম কি ?

উৎপল চোখের পাতা দুটো নাচিয়ে নাচিয়ে বল্‌ল।

— শুক-সারি।

সবিতা মাথার বেণী দুলিয়ে উৎপলের দীর্ঘকায় বপু নিরীক্ষণ করল। উৎপল সবিতার হাতের তালি দুটো জড়ো করে নিজের বুকে চেপে বলল।

—শুক বলে আমার কৃষ্ণের কদমতলায় যানা।

সবিতাও নিজের মাথাটি অনায়াসে উৎপলের বুকে রেখে শুধাল।

—সারি বলে আমার রাধা করে আনা গোনা।

অতঃপর উৎপল সবিতাকে বাহু বন্ধন করে জিজ্ঞেস করল।

—বন্দি যদি থানা হতে পালায় ?

সবিতা উৎপলের চোখা-চোখি স্থির দৃষ্টি দিয়ে বলল।

—বাঁধন শক্ত হলে পালাবে কেমন করে ?

পাশের কর্মরত মালীরা এদিকে আসছে দেখে উভয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে পা বাড়াল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈশাখে দিনমনির প্রখর তেজ নেমেছে ধরার বুকে। খাল-বিলের জল সব শুকিয়ে একাকার। কাদা-মাটি শুকিয়ে চৌচির। হাঁ করে রয়েছে যেন বাঘ শিকারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

কোন একদিন এই খাল বিল ছিল বর্ষার জলে কানায় কানায় ভরা। তখন এই খাল বিলের পূর্ণ যৌবন ছিল। কিন্তু আজ আর সে শ্রী নেই।

সব জল আকাশে মিলিয়ে গেছে। পূর্ণ যৌবনা যুবতীর যেমন আদর আছে তেমনি বর্ষাকালে খরস্রোতা খাল বিলেরও আদর ছিল।

মানুষ এর জল ব্যবহার করেছে।

মাছ ধরেছে। মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। কিন্তু আজ অতি বৃদ্ধের মত নিরস খাল বিলের অবহেলিত অবস্থা। মানুষ গরু শৃগাল কুকুরেরা হয়তো বিদ্রুপ করেই তার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। চারদিকে তপ্ত হাওয়া বইছে। সূর্যদেবের প্রখর তাপে বঙ্গের শ্যাম শ্রী জ্বলে পুড়ে ছাই হচ্ছে। মাঠ ঘাট যে দিকেই তাকানো যায়, শুধু রৌদে খাঁ খাঁ করছে।

এমনই এক দুপুরের খরতাপে উৎপল বাড়ি ঢুকল। গোয়াল ঘরে ধবলী ধুকছিল। তার মুখ দিয়ে লালা ঝরছিল। উৎপল ধবলীকে আদর করল।

অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ্য করে বলল।

—এরা বাড়ি থেকে করে কি? গরুটাকে এক ফোঁটা ফেন জলও দেয়নি।

উঃ! কিছু বললেও দোষ, না বললেও দোষ।

ধবলীকে যত্ন করে গাছের ছায়ায় বাঁধল। তারপর কাস্তে হাতে করে ঘাসের সন্ধানে বের হল।

ঘাস কোথায়?

সব শুকিয়ে গেছে। তবু উৎপল অনেক দূর পর্যন্ত খোঁজ করে প্রত্যহ এক আঁটি ঘাস যোগাড় করে।

উৎপল ঘাস এনে দাওয়ায় বসল। শুভঙ্কর কাঁদছিল। উৎপল তাকে কোলে টেনে নিল। সুরমা বাইরের উনানে রান্না চাপিয়েছে।

একদিকে আগুনের আঁচ অন্য দিকে প্রখর সূর্যতাপে ওর শরীর ঘাম ছিল। মহিতোষ তখনও বাড়ি ফেরেনি।

হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে খেতে চাইছে। এমন সময় সুরমা তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠল। —তোদের চোখ নেই! এত কাজ। কি করে একা সামলাই?

আসলে কথাগুলো উৎপলকেই শোনাল। তাই উৎপল বাড়ি হতে নিষ্ক্রান্ত হল।

—ধুৎ ছাই! দুপুর বেলা তোমার বকর বকর শুনতে আসিনি। একটু জিরিয়ে নিই।

দেবরের এ হেন মন্তব্য শুনে সুরমা ততোধিক ক্ষেপে উঠল।

—তোরা দেখে শুনে কিছু না করলে আমি মরব নাকি! আমি মরলেও কেউ মুখে এক ফোঁটা জল দিবি না। এ দুপুর বেলা বলছি। ভগবান তা সইবেন না। তোদের নিপাত হবেই হবে।

শাপ শাপান্ত পেয়েও ঠাকুরপোকে ফেরানো গেল না।

'মিষ্টি কথায় মজে রসিক কালা চাঁদ'।

কথা বলতে জানলে সব দেবরবাই বৌদিদের মনোমত হতে পারে। সুরমার সে আক্কেল কোন জন্মে হবে কি?

প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে।

একে তো বৌদি দেবরের সদ্ভাব নেই। তার উপর যদি সুরমার মত বৌদিরা কটুভাষায় উৎপল ঠাকুরপোদের কাজের আহ্বান করেন তবে তারা সাড়া দিতে পারেন কি?

ভর দুপুরে মহিতোষ ফিরল।

চাকরকে নিয়ে ঝিঙ্গা শশা গাছে মাচা দেওয়ার জন্য তৈরী হল। এমন সময় গিন্নী এসে হরিসকে একটা ডাব পেড়ে দিতে আদেশ করল। কর্তা বাধা দিল। এতে গিন্নীর রাগ হল। রাগ করে সুরমা অসময়ে শুয়ে পড়ল।

বিকেলবেলা সুরমা কচি আম, লঙ্কা-গুড়ো দিয়ে খাচ্ছে দেখে হরিশ অবাক হল। তার ভাল লাগল না। মনে মনে ভাবল তার বাড়ির বৌ হলে, এক্ষুনি কেটে দুখানা করত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি করা যাবে! বাবুর বাড়ি।

ভালোর জন্য বললে যদি মন্দটা হয়। যদি নতুন কাজটি হরিশ খোয়ায়? তাই দিদিমণির দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকাতে তাকাতে হরিশ নিজের বাড়ির দিকে রওয়ানা হল।

হরিশ বাবুদের বাড়িতে কাজ করে অনেক কথা শিখেছে। সে জানে আজকালকার গিন্নীদের কত ক্ষমতা। তারা বাবুদের একটুতেই কাবু করে ফেলে। হরিশ বলে।

—বাবুদের ভাল-মন্দে নাক গলাচ্ছি নে। বাবুরা যা খুশি করুক। আমার সময় মত পয়সা পেলেই হল।

ধবলী চারসের দুধ দেয়। দুসের বিক্রি হয়। বাকি দুসের নিজেরা খায়। বাচ্চাদের একসেব বাধা ধরা। বাকি অর্ধাংশ স্বামী-দেবরের জন্য রেখে অবশিষ্টাংশ সুরমা নিজে খায়। তার মধ্যে মাঝে মাঝে উৎপল স্কুল থেকে ফিরতে না ফিরতে এতটুকু দুধ এটুকু হয়ে যায়।

খেতে বসে উৎপল অভিযোগ করে—জ'লো দুধ। বৌ-ঠাকরুনের এজন্য রুষ্ট হবারই কথা! তাই পড়শী গিন্নীদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সুরমা অভিযোগ করে– কি রত্ন নিয়েই না আমার সংসার বোন! এত করে খাওয়ালে ও আমার কপালে সুখ্যাতি জোটে না। বলে কিনা—জ'লো দুধ!

এসব নচ্ছার ছেলের কি করে জব্দ করতে হয় তাও বৌ-ঠাকরুন ভাল করে জানেন।

–আসল কথা কি জান: ঘাড়ে একটা চাপলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দাদা-বৌদির হোটেলে খাচ্ছেন তো তাই বাবু টের পাচ্ছেন না তারপর বুঝবে কত ধানে কত চাল। হি-হি ··এরকম কত মরদকেই ন দেখেছি বৌর সামনে জল হয়ে যায়।

ঘরে বৌ এলে কি হবে না হবে তা নিয়ে উৎপলের ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু এ হেন কুলবধূর পরিচর্যায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ভাবল আজকালকার বৌদের সেবা ধর্ম এমনই। উৎপলের ভাবনা হয়তে সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিন্তু খুঁজলে এমন কুললক্ষ্মীর সংখ্যা মোটেই নগন্য নয়।

সংসারের দশ আনা এদেরই দখলে। একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলে ভাঙ্গনের জন্য এও একটা কারণ।

বৌদির অযত্ন দেখে তার প্রতি উৎপলের আর ছিটে ফোটা শ্রদ্ধ

ভক্তিও রইল না। হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়—অন্তরে যদি জ্বালা থাকে মুখে হাসি ফুটবে কেমন করে?

এসব কারণে উৎপল কাজ কর্ম এবং কথা-বার্তার মধ্যে বুঝিয়ে দিতে চায় সে বৌদির আচরণে ক্ষুব্ধ। মুখে কোন কথা বলত না। কারণ সে জানত হিতে বিপরীত হয়। ভালোর জন্য বললেও বৌদি বুঝতে চায় না। তার মনগড়া চিন্তা ভাবনাই চাপানোর চেষ্টা করে।

এরকম অনেকবারই হয়েছে। তর্কে নাজেহাল হয়ে সে এপথই ধরল।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

দুপুরবেলা উৎপল স্নান করে এসে বৌদিকে ভাত দিতে বলল। বৌদি শুয়ে রইলেন। দেবর বুঝতে পারল লক্ষণ ভাল নয়।

উৎপল আর হাঁক-ডাক করল না।

অন্যদের সঙ্গে খাবে বলে বসে রইল। এমন সময় মহিতোষ থলে হাতে বাড়ি ঢুকল। ঐ থলেতে ছিল ধবলীর মসলাদি।

মহিতোষ গিন্নীকে মুগ অড়হর ডাল ভাজতে ও হলুদ বাটতে বলল। অমনি কুললক্ষ্মী ফোঁস করে উঠল। বোগ বুঝে মহিতোষ ভাইকে ডাল ভাজতে বলল।

ভাজার কাজ শেষ।

অতএব মহিতোষ হামামদিস্তাতে ডালগুড়ো করতে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়েরা মহিতোষকে ঘিরে বসল। ছিটকে পড়া ডাল তারা পেট নামক গহ্বরে লুকোতে শুরু করল। তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে গৃহিনী তা লক্ষ্য করল। তাই তিনি জ্বলে উঠলেন।

--ছেলে-মেয়েরা ডাল খেয়ে পেট খারাপ করলে তোমার কোন্ বোন এসে পরিষ্কার করবে শুনি!

হায় ভগবান!

সুরমা কি পাগল হল? এক-দু-তিন···

সময় বয়ে যায়! কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নেই। শুধু হামাম দিস্তার টুং টাং শব্দ পরিবেশকে হালকা করবার চেষ্টা করল। মহিতোষ

নিজের মনেই কাজ করে গেল। কিন্তু উৎপল! বেচারী উৎপল অসহ্য হয়ে উঠল।

দোষ করল একজন। গাল শুনবে তার বোন! কেন? দাদা কি এর প্রতিবাদ করবে না?

রাগে উৎপলের কান দুটো লাল হয়ে উঠল। একে তো দুপুরবেলা খাওয়া হল না; তার উপর সুরমার উল্টোপাল্টা কথাশুনে সে যাৎপরনাই কষ্ট পেল। চোখ মুখে জ্বালা শুরু হল।

দাদা সামনে থাকায় সে নিজেও প্রতিবাদ করতে পারল না। বৌদি কথাটা বলেছে দাদাকে। অথচ এর প্রতিক্রিয়া তাকেও হুল ফোটাচ্ছে। দাদার নির্লিপ্ত ভাব দেখে তার কষ্ট আরো বেড়ে গেল। রাগ যেন সহস্র ফণা তুলে তাকেই ছোবল মারতে উদ্যত হল।

পোষ মানানো সাপের মত উৎপল মনের রাগ মনেই পুষল। তার রাগ, মান-অভিমান—এমনকি নিরপেক্ষ ভাবে কথা বলার অধিকারও নেই। দুমুঠো ভাতের জন্য দাদা-বৌদির কাছে এসব অনুভূতি আমানত রয়েছে! ফলে তার রাগ তাকেই কষ্ট দিল।

উৎপল চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে পুকুর ঘাটে গেল।

হায় অদৃষ্ট!

কি লজ্জার কথা! দাদাটা কান কাটা। উৎপল নিজের মনকে প্রবোধ দিল। উৎপলের মনে যখন এরকম আলোড়ন চলছে তখন দাদার গলা শুনতে পেল। মহিতোষ বকছে---সর্বনাশি সংসারটা ডোবাল। খাওয়ার সময় খেতে না দিলে এমনই হয়।

মন্দের ভাল।

মনে মনে উৎপল সান্ত্বনা পেল। তবু দাদারা কেড়েছে নইলে তার লজ্জা ঢাকার সুযোগ থাকত না। কিন্তু দিদিকে যে গাল দিল তার তো কোন প্রতিবাদ করল না। এজন্য দাদার উপর যেমন রাগ হল তেমনি বৌদির ধরা ছোয়া খেতেও ঘেন্না করল। রাগ করে পরমাত্মীয়া দিদির বাসায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

অনেক দিন হল সবিতার সঙ্গে দেখা হল না। স্বাভাবিক টানে

উৎপল একদিন তাদের বাড়ি এসে পড়ল। কি এক অজানা আকর্ষণে সবিতার সঙ্গে দেখা করতে এল, উৎপল নিজেই বুঝতে পারল না। জ্ঞানীরা এই আকর্ষণকে বলেন 'মোহ'। তা মোহ-ই হোক আর ভালবাসাই হোক উৎপল কিন্তু সবিতার সঙ্গে দেখা করাটা কর্তব্য বলেই মনে করল, এবং এ বাড়ি যে তার খাস মুলুক নয় তা সে বেমালুম ভুলে গেল।

কেননা বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে হাঁক ডাক শুরু করল—কৈ গো মাসি, আপনারা কোথায়? মাসি তখন পুকুর ঘাটে।

মাসির সাড়া না পেয়ে উৎপল শোবার ঘরে ঢুকল। হঠাৎ হাসির মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এল। কারণ সবিতা নাকি তিন দিন থেকে অসুখে ভুগছে। মনে মনে দুঃখিত হল—এ খবর জানতে এলাম!

কাছে গিয়ে দেখল সবিতা সত্যিই সজ্ঞাহীনার মত পড়ে আছে। উৎপলের কাঁদতে ইচ্ছা করল। ইচ্ছা হল ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

হায় অদৃষ্ঠ!

সমাজটা পায়ে পায়ে বেড়ি হয়ে আছে। সোহাগ করতে গেলেই একটা কেলেঙ্কারি ঘটবে। তার থেকে রোগী যেমন আছে তেমন থাক। কৌশলে তার অসুখের খবর জানতে হবে।

সবিতার বোন টুসিকে বলল—তোমার দিদিকে ডেকে দাও, বল উৎপলদা এসেছে।

টুসির ডাকা ডাকিতে সবিতা নড়ে চড়ে বসল।

উৎপল ডাকল—সবিতা।

সবিতা পাশ ফিরে শু'ল।

ততক্ষণে সবিতার মা ঘাট থেকে ফিরলেন।

উৎপলকে দেখেই যেন তার মনের আগুন উথলে উঠল।

কাঁদ কাঁদ হয়ে তিনি বল্লেন—দেখ বাবা মেয়েটাকে দেখ! আমার কপালে শান্তি নেই। নয়তো এখন অসুখ!

হ্যাঁ বাবা সেয়ানা মেয়ে বিয়ে থা তো দিতে হবে। তা পরশু দিন

দমদম থেকে এসে দেখে গেল। সে থেকে এ অবস্থা। হায় অদৃষ্ট!

হ্যাঁ অদৃষ্ট তো বটে।

নইলে উৎপলকে এমন নিষ্ঠুর কথাও শুনতে হল। প্রথমটা উৎপল টাল সামলাতে পারল না। শুনেই চেয়ারে বসে পড়ল। কিন্তু রমাদেবীর আর আনন্দ ধরে না। তিনি বললেন।

—ওরা লোক ভাল। খুব ভাল।

কিন্তু মেয়েটার যে কি হল সে থেকে মুখ হাড়ি করে আছে। এ যে অলুক্ষুনে ভাব!

রমাদেবীর মনের বিচিত্র ভাব তার মুখের ভাষণেই ফুঁটে উঠল। এবার তিনি কন্যার উপর নজর রাখলেন। মনটা দয়াদ্র হয়ে উঠল।

—কি হোলরে বাছা, মেয়েটা সেই থেকে মাথা ধরেছে বলে শুয়ে পড়ল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন কিছু বোঝা'যায় না। কি থেকে কি হয়!

তা যাই হোক।

এতক্ষণ রমাদেবী নিজের কথা নিজেই শুনলেন।

শ্রোতা তো উপলক্ষ মাত্র। এতগুলো কথার মধ্যেও ছেলেটার সাড়া পাওয়া গেল না। রমাদেবীর এতক্ষণে যেন সন্দেহ হল। কথায় ছেদ পড়ল। সবাই চুপ চাপ—ঘরে সূচ পড়ার শব্দও শোনা যায়। ঘর নিঃশ্চুপ হয়ে যাওয়ায় উৎপলের হুশ হল। সে নড়ে চড়ে বসে বলল।

—হ্যাঁ মাসি তারপর কি হল?

যেন উৎপল এতক্ষণ সব কথাই শুনেছে।

অতএব রমাদেবী আবার শুরু করলেন। হ্যাঁ বাবা আজ দেখছি মেয়েটার জ্বর আরো বাড়ল। ডাক্তার ঔষধ দিয়ে গেছে। তাতে খুব একটা আরাম হল না।

রমাদেবী কত কথাই না বলে গেলেন।

কিন্তু উৎপলের মন ছিল সবিতার দিকে। সবিতাও যেন কথার ফাঁকে প্রাণ ফিরে পেল। চাপানো কম্বলটা মাঝে মাঝে তুলে উৎপলের দিকে তাকাল। উৎপলের চোখো-চোখি হতেই আবার মাথাটা কম্বল মুখে দিল। এভাবে তারা কিছুক্ষণ লুকোচুরি খেলল। শেষে সবিতা

মুখ ভ্যাংচাল। উৎপল কিল তুলে সোহাগ করল। আর রমাদেবী ধানের কনা বাছতে বাছতে নিজের কথা অনর্গল বলে গেলেন।

এসব দৃশ্য দূর থেকে সবিতার ঠাকুরমা লক্ষ্য করলেন। বুড়ি বসে বসে পানের রসাস্বাধন করছিলেন। সে দিকে কারুর লক্ষ্য ছিল না। ইত্যবসরে উৎপল থার্মোমিটারটি চাইল। রমাদেবী থার্মোমিটার দিয়ে বললেন—তুমি বস উৎপল, আমি চা করে আনি।

উৎপলের হাতে থার্মোমিটার দেখে এবার বুড়ি খ্যান খ্যান করে বলে উঠলেন।

—হ্যাঁ ভাই তুমি আসল ডাক্তার, থার্মোমিটার দিয়ে আমার দিদি ভাইয়ের জ্বর দেখ দেখি পড়ছে না উঠছে।

—এঁ্যা ঠাকুরমা তুমি সব দেখেছ ?

—ভয় নেই দাদা-ভাই আমি সব দেখেছি। আমার পানটা থেতলে দিলে আর কোন ভয় নেই।

—ঠিক আছে ঠাকুরমা পান থেতলে দেব কিন্তু সত্যি করে বলত তুমি সব বুঝতে পেরেছ কিনা ?

—ওরে ভাই বুড়া কালে কি আর প্রেম করব ?

কৃষ্ণ। কৃষ্ণ! ···কৃষ্ণই আমার সব।

—তা বুঝলাম ঠাকুরমা, আমি বলছি একথা কাউকে বলবে নাতো ?

—হ্যাঁ ভাই ছোটবেলার সব কথা মনে পড়ে, আমরা বিয়ের পর প্রেমের খেলা খেলেছি। আর তোমরা বিয়ের আগেই।

—ও ঠাকুরমা তুমি আমায় মেরেছ।

বলছি একথা কাউকে বলব না তো ?

—'অ' ভাই তুমি আমার নাতীন-জামাই হলে খুব খুশি হব।

উৎপল বুঝল বুড়ি নিজের মত সাজিয়ে কথা বলছে। নয়তো শুনতে পারছে না। সুতরাং আর কথা বলে লাভ নেই। সে চুপ করল। উৎপলের নাজেহাল অবস্থা দেখে সবিতা কম্বলটার তলায় হেসে লুটোপুটি খেল।

রমাদেবী চা নিয়ে এলেন। বুড়ি বৌমাকে দেখে বলল।

—হ্যাঁ মা জামাই যখন হাতের কাছে তখন আর ভাবনা কেন ?

বুড়ির কথা কেউ শুনল না। ওদের কথার মধ্যেই বুড়ির কথা ডুবে গেল। রমাদেবী জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ বাবা তুমি এতদিন এলে না কেন ?

সে যে পরিচয় হল আর এলে না।

—নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম তাই আসতে পারিনি মাসি।

কথা জমল।

রমাদেবী কথার মাঝেই বললেন, উৎপল মেয়েটাকে একটু বোঝাও। সম্বন্ধটা ওর পছন্দ হলে এ গরীব মা-বাবা বাঁচে।

তারপর রমাদেবী শাড়ীর আঁচলে চোখের জল মুচলেন। এমনিতেই উৎপলের বুকখানা ভাঙ্গল। তার উপর চোখের জল দেখে সে অস্থির হল।

ইচ্ছে হল মাসিকে সান্ত্বনা দেয় --এত ভাবছেন কেন মাসি গরীবের মেয়ে বলে কি বিয়ে হবে না! আমি তো রয়েছি।

কিন্তু কিসে কি যে হল উৎপল কোন কথাই বলতে পারল না। বরং লজ্জায় মনটা মুষড়ে গেল। শোকে দুঃখে তার কান্না আসছিল-- তাকেই শুনতে হল সবিতার দেখাশুনার কথা। উৎপলকে যদি জানতেন রমাদেবী তাহলে হয়তো এমন করে বলতেন না। কিন্তু তাঁর দোষ কী ? তিনি যে কন্যা গ্রস্ত মা। তিনি তো জানতেন না সবিতা কোন অসুখে ভুগছে !

এমনি কথোপকথনের সময় সবিতা উঃ। আঃ! করে পাশ ফিরল। উৎপল মাথায় হাত দিয়ে বুঝল জ্বর আরো বেড়েছে। মাথা অত্যধিক গরম হয়ে উঠেছে। উৎপল পানাপুকুর থেকে এক বালতি ঠাণ্ডাজল এনে সবিতার মাথায় ঢালল। রমাদেবী ওর চুলগুলো গামছা দিয়ে মুছে দিলেন। সবিতা চোখ মেলে দেখল উৎপল পাশে বসে আছে। মা হাওয়া করছে। সবিতা মনে মনে ভাবে উৎপল যদি সব বিপদের দিনে এমনি করেই সাহস যোগায় ?

তারপর মিটি মিটি চেয়ে বলল।

—উৎপলদা তুমি কি আমাদের ভুলে গেলে ?

—না, ভুলিনি। তবে কি জান, একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—তাহলে কাজ নিয়েই থাক।

বাকি কথা সবিতা মুখের ভঙ্গিতেই সারল। পরক্ষণে লজ্জিত হল এবং মুখ ঢাকল। রমাদেবী যেন নতুন ইঙ্গিত পেলেন। ওরা কত সহজ ভাবে কথা বল্‌ল। পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা না থাকলে এমন অধিকার জন্মায় কি করে! এ যে হাসি ঠাট্টা নয় দায়িত্বপূর্ণ কথা।

সবিতা যেন মৃদুভাবে ধমকাল। আর উৎপল আমতা আমতা করে সে শাসন মেনে নিল।

রমাদেবী অবাক হলেন।

সবিতা এত অধিকার পেল কোথায় ? মনে মনে খুশি হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল সবিতার জ্বর অনেক পড়ে গেছে রমাদেবী আশ্চর্য হলেন। এসব ঘটনার মধ্যে যেন একটা সিদ্ধান্ত আছে। রমাদেবী অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। ওদের কথা বলার সুযোগ দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। এবার অবগুণ্ঠনা সবিতা প্রকাশিত হল। উৎপল তার মনের কথা জানার জন্য ব্যাগ্র হল।

—লক্ষীটি তোমার কি হয়েছে বল না।

—কেন ? মায়ের কাছে তো সবই শুনলে।

—তুমি ওসব বাজে কথা নিয়ে ভেব না।

দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

উৎপল রসিকতা করল।

—বরের নজর পড়লে বুঝি জ্বর হয়!

—এই বাজে কথা বল না।

বেশ তবে আজ আর বসব না। মাসি আবার কি ভাববেন!

—তা ঠিক। তাহলে বল, এখন এ যে ঝামেলা হচ্ছে আমি কি করব ?

—তাইতো মাসিমা জিজ্ঞেস করলে আমিই বা কি বলব ?

— আমি কি জানি ছাই! তুমি পুরুষ না!

তোমার ভাবনা তুমি ভাব ; আমাকে যা বলবে আমি শুনব।

—ঠিক আছে তুমি কিছু ভেব না। আমি সব ব্যবস্থা করব।

সবিতা ভরসা পেল।

—তুমি তো আমার সব। মাকে একটা কিছু বলে যাও।

—মাসি আমি যাচ্ছি।

—এখানে এস উৎপল ; শুনে যাও।

—বলুন।

—হ্যাঁ বাবা সবিতা কি মতামত দিল ?

—দেখুন মাসি ওর ইচ্ছা স্কুল ফাইনালটা দিক !

তারপর আপনারা যেমন খুশি করবেন।

—দেখ উৎপল আমারও ইচ্ছা মেয়েটা স্কুল ফাইনাল দিক কিন্তু তোমার মেসো বলেন 'আমি বুড়ো হয়েছি এবার একটা ব্যবস্থা করি।'

—না মাসি এক বছরে ওনার কিছু হবে না।

ওসব বিয়ে থার কথা স্বপ্নেও ভাববেন না।

উৎপল মনে মনে খুশি হল - চমৎকার প্রস্তাব রেখেছি তো !

সবিতাদের বাড়ি থেকে ফিরতে দেরি হল। তাই দাদার কাছে বকুনি শুনল উৎপল—সারাদিন ঘুরে ঘুরে কাটালে চলবে কেমন করে ?

অকারণে ভাইয়ের অভিমান হল—দাদা যেন কী ! আমি বড় হয়েছি, কোথায় কোথায় যাই সব কৈফিয়ত দিতে হবে !

আবার মনে মনে খুশিও হল বেশ, বকুনি খেয়েছি তো সবিতার জন্য। তাতে কি ! দরকার হলে আরো কঠিন শাস্তি মাথা পেতে নেব। মনে প্রত্যয় জাগে।

সবিতার বাবার নাম সমীর ঘোষ।

তিনি অবসর প্রাপ্ত কেরানী। অবসরকালীন যে টাকা পেয়েছেন মেয়ের বিয়ে এবং ডাক্তারের পিছনেই সব খরচ করেছেন। এখন পেনশনের টাকাই বার্ধক্যের ভরসা।

সবিতার টিউশনির টাকা এবং সমীরবাবুর পেনশনের টাকাতে সংসার খরচ চলছিল। ব্যাঙ্কে যৎসামান্য যা কিছু ছিল তাতে কেউ হাত দিল

না। বিপদের দিনে কাজে লাগবে বলে রেখে দিলেন। অতএব স্বাভাবিক ভাবেই সংসারটা টানা হেছড়ার মধ্যে চলছিল। সবিতার স্কুলের মাইনে দিতে হয় না।

'ফ্রি, স্টুডেন্ট।'

তার উপর বড় দিদিমণি স্কুলের বই দিয়ে তাকে সাহায্য করেন। সমীরবাবুর কিছু ধান জমিও আছে। অতএব মোটা-মুটি ভাত কাপড়ের কোন অভাব হয় না। রমাদেবী নিজেই সংসারের তত্ত্বধান করেন।

কিন্তু সমীরবাবুর সর্বক্ষণের সাথী—চিন্তা ভাবনাগুলো ইদানিং তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। বার্ধক্যের চিন্তা তাছাড়া হাঁপানির অসুখে তিনি কাবু হয়ে পড়লেন। তার মানসিক পরিবর্তনের জন্য বড় মেয়ে এসে তাকে নিয়ে গেল। আর এ সময়ে সবিতার দেখাশুনা হয়। সুতরাং সমীরবাবু এর কিছুই জানতেন না। তিনি মেয়ে বাড়ি থেকে ফিরে সব জানতে পারলেন। স্কুল-ফাইনাল পাশ করার পর সবিতার বিয়ে হোক, এ মতে সম্মতি দিলেন। তবে দেখাশুনার মধ্যে তিনি দোষ খুঁজে পান না। যাইহোক বিয়ের ব্যাপার তখনকার মত ধামা চাপা পড়ে গেল। উৎপলদের রেজাল্ট আউট হল।

গেজেট বইয়ের জন্য উৎপল চারদিকে ছুটোছুটি করল। সময় মত একটা গেজেট বই পেল। পাশও করল। কিন্তু মনোমত ফল করতে পারল না। তার জন্য উৎপল দুঃখে কাতর হল। চোখের উষ্ণ জল ঝর ঝর করে ঝরল। বন্ধুরা তাকে সান্ত্বনা দিল। তুলনামূলক যে তারাও ভাল ফল করতে পারল না সে দৃষ্টান্তও দিল। তাতে তার শোক দ্বিগুণ হয়ে প্রকাশ পেল কারণ উৎপল যদি অন্যদের মত পড়ার সুযোগ পেত তাহলে আজকের দিনে তাদের সান্ত্বনার প্রয়োজন হত না।

উৎপলের শোক ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। তখন মনে পড়ল সবিতার কথা। লজ্জায় ভেঙ্গে পড়ল। কি করে সবিতাকে মুখ দেখাবে? সে যে খারাপ ছাত্র নই একথা কি সবিতা বিশ্বাস করবে!

যাইহোক এ চরম সত্য উৎপলকে মেনে নিতে হল। বিকেলবেলা পায়ে পায়ে সবিতাদের বাড়ি এল। পাশ করার কথা শুনে সবিতার

মা-বাবা খুশি হলেন। সবিতাও খুশি হল। এ কৃতিত্ব যেন তার জয়ের সূচনা করল।

মার্কসীট পেল।

এবার ভর্তির পালা। এক সময় অনার্স কোর্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এহেন অবস্থায় সে আশা বিলীন হল। রাজকীয় কলেজ-গুলো সাত শত মার্কের উপরে পাওয়া পার্থীদের অনার্স এবং পাঁচশত মার্কের উপর পাওয়া প্রার্থীদের পাশ কোর্সে ভর্তির অনুমতি দিল। উৎপল দরিদ্র মার্কসীট নিয়ে কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে কাটাল। মনে মনে দুঃখিত হল তাহলে তার মত মার্ক পাওয়া কিংবা তার চেয়েও কম মার্ক পাওয়া ছেলেদেব কি হবে? তারা কি পড়াশুনা করার অধিকার পাবে না? মার্ক বেশি পেলে ভাল ছাত্র আর মার্ক কম পেলে ভাল ছাত্র নয় এ কেমন বিচার! কম মার্ক পেয়েছে তাদের মধ্যেও এমন বহু মেধাবী ছাত্র আছে যারা সুযোগ পেলে অনেক উন্নতি করতে পারে। সে সব ছাত্রদের কি হবে?

উঃ! কী ভয়ানক ব্যাপার।

ভাবলেও শরীর শিউরে উঠে। বহু ছাত্রের বুঝি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না! উৎপল ক্ষুব্ধ হল। কিন্তু অরণ্যে রোদন করে লাভ কী?

এদিকে তার মত নম্বর পাওয়া ছেলেরা অন্য লাইনে যেতে শুরু করেছে। সুতরাং সময় থাকতে সাবধান হওয়া দরকার। উৎপল মনে মনে শঙ্কিত হল এতদিন যে সত্যকে মনে প্রাণে ভালবেসে এসেছে। লালন-পালন করে এসেছে তা কি করে ত্যাগ করবে? অন্য লাইনে অনার্সের চেয়ে নিজের লাইনে পাশ কোর্সই ভাল।

কিন্তু ভর্তি হওয়ার টাকা কোথায়?

সমস্যা ঘনিভূত হল কেননা দাদার সংসার প্রায় অচল। মহিতোষ নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করল। উৎপল দীনবন্ধু এনড্রুজ কলেজে ভর্তি হল।

উৎপল কলেজে ভর্তি হয়েছে প্রায় একমাস হল। এর মধ্যে ক্লাস খুলেছে। দু-একদিন ক্লাসও করেছে। এখন বই কেনা দরকার।

টাকার প্রয়োজন। কিন্তু টাকা কোথায়?

সংসারে অর্থ সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কেননা—প্রথমতঃ সুরমার বেহিসাবি খরচ ও অপচয়। দ্বিতীয়তঃ মহিতোষের নির্বুদ্ধিতা। তৃতীয়তঃ মামলায় জড়িয়ে পড়া। চতুর্থতঃ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় সংসারের প্রতি অমনোযোগ।

হায়, সরলতা। হায় নীতি ধর্ম!

প্রশান্তচিত্তের মানুষ, তোমার বদান্যতার সুযোগ নিয়ে প্রবঞ্চক তোমায় ঠকায়। তোমার সরলতার সুযোগ নিয়ে তোমাকে কোণঠাসা করে। তৎসত্ত্বেও তুমি ধর্মচ্যুত হও না। তাই তুমি মহান।

মহিতোষ যতদিন তোমার অর্থ ছিল সবই ছিল। তোমার অর্থ ফুরালো। বন্ধুদের আনাগোনাও বন্ধ হল। এটাই বাস্তব সত্য। ফুলের মধু যতদিন থাকে ভ্রমরাও ততদিন আনাগোনা করে। মধু ফুরালে ভ্রমরা নতুন শিকারে বের হয়। অতএব আজ তোমাকে কেউ ব্যক্তিগত সম্মানও দেবে না। এ আর বিচিত্র কি!

মহিতোষ মনে ঘৃণার উদয় হয় কী?

মনে প্রশ্ন জাগে কি দুনিয়াটা তবে ছল চাতুরি প্রবঞ্চনা ও ভ্রষ্টাচারে ভরে গেছে?

না প্রশ্ন করো না। পৃথিবী বড় বিচিত্র। আর তার চেয়ে বিচিত্র —মানব চরিত্র!

দেখ বনে হিংস্র জন্তুর বাস।

তাদের চেনা সহজ কারণ হিংস্রতা তাদের লক্ষণ। কিন্তু মনোবারণ্য চেনা কঠিন। কেননা এখানে কে বন্ধু আর কে শত্রু বোঝা ভার।

বন্ধুর বেশে শত্রু নাশ করতে উদ্যত হয়। ঠকায়। যে বনে হিংস্র জন্তুর বাস সে বনেও পবিত্র চন্দন কাঠ তার সুগন্ধ বিতরণ করে। অথচ বিষধর সাপ তাকে জড়িয়ে থাকে। তবু চন্দন তার সুগন্ধ বিতরণ করে। এখানে তোমরা সারাজীবন ক্ষয়ে ক্ষয়ে পরের হিতকর। এটাই বিচিত্র!

ভাদ্র মাস। মহিতোষের সংসার তরণী সংকটের মুখে পড়ল

উপার্জ্জন নেই। খদ্দের আছে মাল নেই। পুঁজির অভাব। ধার কর্জ ছাড়া বাজার হয় না। এমতাবস্থায় কেউ ধার দিতে সাহস পায় না। একদিকে গণেশ উল্টাল অন্যদিকে সংসারের তাড়না। মহিতোষ হতাশ হয়ে পড়ল। মহাজন ধর্ণা দিল পাওনার জন্য। বন্ধুরা চাইল ধারের টাকা।

বিপদ!

এ বিপদে বাঁচার এমন কেউ নেই। ওপার বাংলার বুড়ো বাপ। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুও ছেলেদের বিপদে কোন সাহায্য করতে পারলেন না। কেননা হাল সনে প্লাবনে সব শস্য নষ্ট হয়ে গেছে। তার নিজেরই টেকা দায়।

সামনে পূজো।

মহীতোষ পুঁজির অভাবে মাল তুলতে পারল না। ঘরে চাল নেই, তরকারি নেই। ধারের টাকায় সংসার চলছে তার উপর মামলা। নিদারুণ হতাশ ও অভাবের মধ্যে সংসারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তার উপর সুরমার অভাব অভিযোগ, গাল মন্দের ভার বহনে মতিতোষ দিশেহারা। ফলে মহিতোষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

হায়! সুরমা এ কি তোমার ভালবাসা?

স্বামীর বিপদে না দিলে সান্ত্বনা, না করলে সহযোগিতা। তোমার নিজ স্বার্থই যায়! স্বামী নাকি দেবতা।

তাহলে স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্খায় কি করলে? তোমরা আধুনিকারা নাইবা মানলে দেবতা কিন্তু সংসার সুখ! সংসার কি একা স্বামীর? তোমরা কি শুধু সন্তান ধারণ করার জন্যই বাঁচ? হায়! কর্মে সেবা-ধর্মে বিপদে-আপদে স্বামীর পাশে দাঁড়ানো মহীয়সীর যুগ গেল কোথা?

এ নিদারুণ সঙ্কটের দিনে মহিতোষের কাছে স্ত্রী পুত্র ভাই আত্মীয় স্বজন সবাই বিষ হয়ে দাঁড়াল। যেই হোক, কোন কথা বলতে এলেই মহিতোষ ঝঙ্কার দিয়ে উঠে—সবাই আমার শত্রু। সবাই ক্ষতির চেষ্টায় আছে।

ভাদ্র মাসের শেষ দিকে একদিন মহিতোষ কোন এক বন্ধুর কাছে ভাইকে টাকার জন্য পাঠাল। উৎপল ফিরে এসে দেখল দাদা দোকানে নেই। দাদার হিতৈষী প্রিয় বন্ধু পরিতোষবাবু বসে আছেন। সে সময় একজন খদ্দের দোকানির অপেক্ষায় ছিল।

উৎপল খরিদ্দার বিদায় করল।

তারপর পরিতোষবাবুর কাছে, দাদার খবর জানতে চাইল। ভদ্রলোক বললেন—তোমার দাদা পার্টির মিটিং-এ গেছে। দেখছি এমনি করে ও ব্যবসার ক্ষতি করছে।

উৎপল এবার সাহস পেল।

প্রসঙ্গক্রমে পরিতোষবাবুকে সংসারের দুরাবস্থার কথা বলল। এ অচলাবস্থার জন্য মহিতোষের খামখেয়ালিপনা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য দায়ী করল, এবং দাদাকে ঐ ভয়ঙ্কর পথ থেকে ফেরানোর জন্য অনুরোধ করল।

ভদ্রলোক মহিতোষকে অনেক বোঝালেন এবং রাজনীতির সঙ্গে না জড়ানোর পরামর্শ দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উৎপলের কথাও এসে পড়ল। কিন্তু হিতে বিপরীত হল। বন্ধুর কাছে সংসারের কথা বলায় মহিতোষ অপমান বোধ করল। পরদিন মহিতোষ ভাইকে ডেকে বলল।

—তুমি আমার খাবে আর আমার বদনাম দেবে, তোমার মত ভাই আমার দরকার নেই। আজই আমার থেকে দূর হও।

উৎপল মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝল না।

দাদার ভংসনা ও অবহেলা দেখে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ল। যে সংসার দাদা-ভাই উভয়ের কষ্টে গড়া সে সংসার দাদার একার হল! বাপের টাকা, ভাইয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম কোন কিছুর মূল্য নেই। এতবড় অপমান অবহেলা উৎপল সহ্য করতে পারল না। তাই প্রতিজ্ঞা করল আর দাদার অন্ন ছোঁবে না।

দাদার অবহেলার কথা উৎপল ভেবেছে তত তার মনের আগুন বেড়েছে। ভাবল দাদার কাছে তার কোন দাম নেই। চিরদিন সে দাদার কাছে অবহেলিত। এ আর সহ্য হয় না। নিজেকে একটা কিছু

করতে হবে নইলে দাদা তাকে মানুষ বলেই মনে করবে না। অতএব উৎপল দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল মানুষ না হওয়া অবধি আর সংসারে ফিরবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নতুন পরিবেশ।

সবাই আনন্দিত। কেউ গল্প করছে, কেউবা শুনছে। আর কেউ হাত তালি দিচ্ছে। হৈ হুল্লোড় করছে। একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাচ্ছে। নতুন বন্ধুর নাম ধাম ঠিকানা লিখে পাতা ভরাচ্ছে। কে কোন স্কুল বা কলেজ থেকে এল এমনি হালকা কথার মধ্যে সেকেণ্ড মিনিট কেটে গেল। যারা গ্রাম থেকে এল তারা শহরে তারিফ করল। সিনেমা, থিয়েটার, ক্রিকেট ফুটবল······ইত্যাদি রং মিছিলের গল্প গুজবে সময় কাটছিল সবারই এক কথা—First year don't care

ডিগ্রি কোর্সের প্রথম বর্ষ।

পড়াশুনার বিশেষ চাপ নেই। তাই সবার মনে নবীন কল্পনার অনির্বচনীয় আনন্দ। কিন্তু এত আনন্দ কোলাহলের মধ্যেও একজনকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে। সে নিরানন্দ ও গভীর চিন্তায় মগ্ন। নতুন পরিবেশের আনন্দ কোলাহল হার মানল এই ছেলেটির চিন্তার কাছে। কি ভাবছিল ছেলেটি! আধ্যাত্মিক জগতের কথা না ইহকাল পরকালের কোন সুক্ষ্ম চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে?

না।

এ সব ভাবনা নয়। তাহলে বুঝতে পারছেন ইনি হলেন আমাদের সে অসহায় উৎপল। ভাবছে তার সমস্যার কথা। পিছন বেঞ্চের অমলেশ বৈচিত্রতার মধ্যে এ নিরানন্দ ছেলেটিকে দেখে যাৎপরনাই দুঃখিত হল। সে কাছে এগিয়ে এল।

—কি ভাবছেন?

—না, এমন কিছু না।

—হায়ার সেকেণ্ডারী না পি-ইউ?

—হায়ার সেকেণ্ডারী।

—আপনার নান জানতে পারি?

—উৎপল।

—আমার নাম অমলেশ।

এমনি আলাপের রাগিনীতে তুজন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। উৎপল এতক্ষণে একজন মনের মত সঙ্গী পেল। এমন উৎসাহী বন্ধুকে পেয়ে হাল্‌কা হবার চেষ্টা করল। মনের গোপন কথা আপনার থেকে বেরিয়ে পড়ল। অমলেশ উৎপলের প্রত্যেকটি কথা মন দিয়ে শুনল। বন্ধুর তুঃখে তুঃখিত হল। উৎপলও দেখল এমন করে আর কেউ সহানুভূতি দেখায় না। তার মনের কথা জানতে চায় না। তার মর্মবেদনা যে বুঝতে পেরেছে সে নিশ্চয় ভাল ছেলে। সুতরাং এমন বন্ধুকে পেয়ে উৎপল মনে বল পেল। সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে বন্ধুকে অনুরোধ করল।

--একটা লজিং খুঁজে দাওনা ভাই।

—ঠিক আছে তুমি কিছু ভেব না।

অমলেশ কথা দিল।

কলেজ ছুটি হলে বন্ধুকে বিদায় জানাল উৎপল। অমলেশের বাড়ি কলেজের পাশেই। গড়িয়ায় 'মা ভবন'। অমলেশ মা ভবনে ফিরল। উৎপল মামার বাড়ি ফিরল।

পরদিন। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজল।

সবাই ক্লাসে বসে পড়ল। উৎপল এদিক ওদিক তাকাল। কিন্তু সে পরিচিত মুখটির দেখা পেল না। প্রফেসর ক্লাসে ঢুকলেন। ডিপারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের ক্লাস। ঘণ্টা পড়ল। প্রফেসর চলে গেলেন। পিছন থেকে অমলেশ এগিয়ে এল। পিঠে হাত দিয়ে বলল।

—কেমন লাগল উৎপল?

তড়িতাহতের মত চমকে উঠল।

—হ্যাঁ ভাল লাগল। আরে তুমি!

কোথায় ছিলে এতক্ষণ? বোসো, বোসো।

—না, বসবো না।

শোন উৎপল, ছুটির পর আমার সঙ্গে যাবে। মায়ের পক্ষ থেকে তোমাকে নিমন্ত্রণ করলাম।

উৎপল নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশি হল।

—নিশ্চয় যাব। কিন্তু মায়ের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করার মানে কি?

—তোমার সম্বন্ধে মাকে বলেছি। মা বল্লেন তোর বন্ধুকে নিমন্ত্রণ কর।

—বেশ ভাল, কিন্তু আজই কি যেতে হবে?

—হ্যাঁ আজই।

অমলেশের বাবা ফোর্ট কমিশনে চাকরী করেন। মোটা মাইনে পান। রাতে অমলেশের বাবা বাড়ি ফিরলেন। আগেই তিনি পুত্রের মুখে উৎপলের কথা শুনলেন। অমলেশ পরিচয় করে দিল।

—ও আমার বন্ধু উৎপল।

উৎপল অবিনাশবাবুকে প্রণাম করল।

—সুখে থাক বাবা; বস আমি জামা কাপড় খুলি।

রাতটা এখানেই কাটল।

সকালবেলা অবিনাশবাবু কাজে বের হবার সময় বললেন।

—উৎপল তুমি আমার বাড়ি থেকে পড়াশুনা কর আর ছোট ভাই বোনদের পড়াশুনা দেখ।

নিশ্চিন্ত হল উৎপল। এ দুঃখের দিনে অবিনাশবাবু বড় উপকার করলেন। বন্ধুর সহানুভূতিতে খুব খুশি হল উৎপল। অমলেশকে প্রতিদানে কি বলে ধন্যবাদ জানাবে ঠিক করতে পারল না। অমলেশকে জড়িয়ে ধরে বলল—তুমি এত ভাল। পরদিন নিজের বেডিং পত্র নিয়ে লজিং বাড়িতে এল। অমলেশের মা উৎপলকে নিজের ছেলের মত ভালবাসলেন।

সম্ভ্রান্ত ঘরের আদুরে কন্যা প্রমীলা।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ছোট বেলাতে মাও ভাইকে হারালেন।

তেইশ বছর আগের কথা। ভারত উপমহাদেশ টুকরো হবার প্রাক্কালে দেশে এল দাঙ্গা। এ কুখ্যাত দাঙ্গায় পাকিস্তান রাষ্ট্রে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ নর-নারী পশুবলীতে পরিণত হল। ধূলায় লুণ্ঠিত হল নারীর মান ইজ্জত। লক্ষ লক্ষ নর-নারী লাঞ্ছিত নিগৃহীত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিল। বহু স্বপ্নের সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

প্রমীলার বাবা বহু লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করে কোন রকমে ষোড়শী কন্যাকে নিয়ে ভারতে এলেন। বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটতে লাগল। তারপর এক সময় সরকারী সাহায্যে টালিগঞ্জ বস্তিতে বাস করতে লাগলেন।

ইতোমধ্যে সরকার থেকে নগদ অর্থও পেলেন।

ষোড়শী কন্যা দেখতে দেখতে ষোলকলায় পূর্ণ হল। অন্য গৃহস্থ ঘরে গরীব মা-বাবা যেমন রাত অনিদ্রায় এবং দিন দুর্ভাবনায় কাটিয়ে দিতে সক্ষম হন ; এহেন বৃদ্ধের ক্ষেত্রে তা হল না। বৃদ্ধ অনাহার ও দুর্ভাবনায় ক্রমশ কৃশ হলেন। সঙ্গে দেখা দিল হাঁপানি। দায়গ্রস্ত পিতার ভাবনা ষোড়শী কন্যার রূপগুলোর সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে বেড়ে গেল। বাপ যমরাজের কোলে আশ্রয় নিয়ে রেহাই পেলেন। আর প্রমীলা অনাথ হলেন।

আর একটি পরিবার।

অবিনাশবাবুও এ দাঙ্গায় নিঃস্ব হয়ে ভারতে আশ্রয় নিলেন। তিনিও একই বস্তিতে স্থান পেলেন। তারপর ভাগ্যক্রমে পোর্ট কমিশনে একটা চাকরী জুটে গেল। তিনি লক্ষ্য করলেন নিঃসহায় বৃদ্ধ পিতা দুর্ভাবনাকে ঠেলে সরে পড়লেন। কিন্তু তারই ষোড়শী কন্যা সে দুর্ভাবনাকে দ্বিগুণ করে মাথায় তুলে নিলেন।

প্রমীলার কান্না অবিনাশবাবুর বুকে বাজল। তিনি এ অসহায় যুবতীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন। তারপর বিশটি বছর পার হয়ে গেল। অবিনাশবাবু স্বচেষ্টায় উদ্ধতন পদে উন্নীত হলেন। চাকরির টাকা দিয়ে গড়িয়ায় বাড়ি কিনলেন। বর্তমানে অবিনাশ কুড়ি বছরের যুবক।

স্বাভাবিক কারণে উৎপলকে জানতে পেরে অবিনাশবাবু আশ্রয় দিলেন।

নিশ্চিন্ত।

হ্যাঁ উৎপল নিঃশ্চিন্ত হল। সুতরাং সবিতার কথা ভাবতে ফুরসৎ পেল। সবিতাকে অকপটে সব কথা জানাল। এক বছর পর সবিতার ফাইনাল পরীক্ষা। তার জন্য পড়াশুনা করতে উপদেশ দিল। অমলেশ এবং উৎপল এক সঙ্গে কলেজে যায়। বিকেলে কলেজ ছুটির পর বাড়ি ফেরে। জলখাবার খেয়ে উৎপল অমলেশের ভাই-বোনদের নিয়ে পড়তে বসে। আর অমলেশ তার অন্য সাথীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। আবার নৈশ ভোজের পর দু'বন্ধু এক সঙ্গে পড়তে বসে।

সকালবেলা উৎপল ঘুম থেকে উঠে ছেলেমেয়েদের পড়ায় তারপর নিজের পড়াশুনা করে। এমনি করে উৎপলের দিনগুলো কাটছিল। দিনে সময় কম। তাই উৎপল রাত জেগে পড়াশুনা করে। অন্নের চিন্তা ছাড়াও অপরাপর খরচ আছে। কলেজের মাহিনা, হাতখরচ, পোষাক পরিচ্ছদ···ইত্যাদি। অতএব প্রচুর টাকার দরকার। প্রথম দিকে বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন থেকে ধার করে চলেছে। সব সময় তো চলে না। বই কাগজ কলম কত খরচই না আছে। এজন্য উৎপল টাকা উপার্জনের কথা ভাবল। আটার ব্যবসা করবে বলে স্থির করল। কলেজ থেকে ফিরে খোলা বাজারে গম কিনে ভাঙ্গিয়ে বাজারে আটা বিক্রি শুরু করল।

বাজার থেকে ফিরতে রাত হয়।

ফিরে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর সময় হয় না। এভাবে অমলেশের ভাই-বোনদের পড়াশুনায় যেমন ক্ষতি হচ্ছিল তেমনি উৎপলের নিজের পড়াশুনায়ও ক্ষতি হচ্ছিল। তবু মন্দের ভাল। খেয়ে পরে এখনও পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভালটা উৎপলের কাছে হতে পারে কিন্তু অবিনাশবাবুর দিকে নয়। লজিং মাষ্টার দুবেলা না পড়ালে হবে কেন? অবিনাশবাবু মনে মনে ক্ষুন্ন হলেন। অমলেশের মায়ের দিক থেকেও মায়া মমতা কমে এল। অমলেশও বন্ধুর হয়ে কিছু বলতে পারল না।

একে একে উৎপলের আদব এবং কদর দুই কমে গেল। কয়েকদিন আগেও উৎপল অবিনাশবাবুর বাড়িতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল। আজ আর সে অবস্থায় নেই। বাড়ির সবাই যেন চিনেও চেনে না। সবার সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ার উপক্রম। উৎপল এর প্রতিকার করতে চাইল। সদ্ভাব ফিরে আনার চেষ্টা করল কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। সময় খুব কম। সকাল বেলা ছাড়া পড়ানো সম্ভব হয় না।

মাস দুয়েক পর অবিনাশবাবু উৎপলকে ডেকে বল্‌লেন—উৎপল তোমার তো সময় হয় না। ওদের পড়ানোর জন্য মাষ্টার রেখেছি। তিনি উৎপলকে যেতেও বল্লেন না, থাকতেও বল্লেন না। এতে উৎপল আরো বেশী বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হল। সুতরাং অবিনাশবাবুর বাড়ি ত্যাগ করার সংকল্প নিল। পাশের বাড়িতে একটা কোঠা ভাড়া নিল। লজিং বাড়ি ছাড়ার পর অনেক সময় হাতে পেল। রাত জেগে পড়ার দরকার হয় না।

তিনটে মাস অতীত হল।

সবিতাদের কোন খোঁজ-খবর নেই। দুর্গোৎসবও হয়ে গেল। সামনে কোজাগরী পূজা। উৎপল চিন্তিত হয়ে পড়ল। একবার বাড়ি যাওয়া দরকার। হাতে টাকা-পয়সাও নেই। নিজের বই কেনার টাকা জোগাড় করা দায়। তার উপর বাড়ি গেলে বাড়তি খরচ। অতএব আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত মনে করল।

এদিকে কয়েকজন বন্ধুও কলেজ লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়াশুনা করছে। এভাবেই পড়তে হবে। কেননা তাকে যে বড় হতেই হবে। শৈশবের স্বপ্ন কৈশোরেও অটল রইল। কিন্তু সব দুঃখকে সয়ে নেওয়া যায় যদি সবিতার সুখের কথা জানতে পারে। অথচ নিজেও অর্থ নৈতিক দুর্বলতার জন্য সবিতার সামনে যেতে লজ্জা করে। আর এজন্য সবিতার সঙ্গে দেখা করতে পারল না।

উৎপল অনেক চিন্তাভাবনা করেও শেষ পর্যন্ত দুর্গাপূজার ছুটিতে বাড়ি যেতে পারল না। বাড়ি গেলে সবিতার হাতে কি তুলে দেবে! এ ভাবনায় শেষ পর্যন্ত বাড়ি যাওয়া হল না! স্বাভাবিক কারণে মনের

অস্থিরতার মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেল। এমনি যখন মনের অবস্থা তখন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন সবিতার একটি চিঠি পেল।

কান্না ভরা চিঠি।

চিঠি পেয়ে উৎপল উদ্বিগ্ন হল। শুভ বিজয়ার দিন সবিতার বাবা হাঁপানির অসুখে পরলোক গমন করেন। এখন উৎপল বলুক সবিতার কি হবে?

উৎসাহের চিঠি নয়। দায়িত্ব তুলে নেবার চিঠি। খামে ভরা চিঠি পড়তে পড়তে উৎপলের দু-চোখ ঝাপসা হয়ে এল। অসমাপ্ত চিঠি টেবিলের উপর রেখে হাতের কব্জির উপর মাথা রেখে ভাবতে লাগল। ক্রমে সূর্যদেব তার লাল আবির ছড়িয়ে গোধূলির সূচনা করল। দূরে পাখিরা কিচির-মিচির গান ধরল। বকেরা সাদা ডানা মেলে বাসায় ফিরল।

আরো দূরে লক্ষ্মীপূজার দীপাবলীর আলোকে বাড়িগুলো আলোকিত হল।

ছেলেদের উৎসাহ আর বাজীর শব্দ কানে ভেসে এল। কিন্তু এ বৈচিত্রতা উৎপলকে আকর্ষণ করল না। গোধূলির ছায়ায় ছায়ায় উৎপলের মন চিন্তায় আবিষ্ঠ হল। উঠি উঠি করে আর উঠা হল না। দেহ মন অলসতায় ছেয়ে গেল।

অজান্তে মেঝের উপর পাতা মাদুরে শুয়ে পড়ল। দূরে দেওয়াল ঘড়ির সাত সাতটা ঢং ঢং আওয়াজ ক্ষণিকের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা কয়ল। ঘড়ি যেন বলছে—উৎপল এখন ঘুমোবার সময় নয়।

ঘড়ির সাবধান বাণী নিদ্রাদেবী যেন আমলই দিলেন না। ঘুমের নেশার মধ্যে এতক্ষণ চারদিকের চলমান ঘটনাবলী টের পাচ্ছিল। এখন আর তাও নেই। উমাচরণবাবুর দেওয়াল ঘড়ি আবার প্রশান্ত মনে নিজের কাজে যোগ দিল। ঘড়ির কোন অলসতা নেই। স্থবিরতা নেই। দুঃখ নেই।

আপনাকে জানা; আপনার কাজ করাই যেন ঘড়ির লক্ষ।

সকালে ঘুম ভাঙ্গল।

এমন সময় দেওয়াল ঘড়িটা ছয় ছয়টা ঘণ্টা বাজিয়ে প্রভাতের সূচনা করল। উৎপল তড়িৎবেগে উঠে পড়ল। রাতে রুটিগুলো খাওয়া হল না। হাত মুখ ধুয়ে অসমাপ্ত চিঠিখানা পড়তে বসল। সবিতার চিঠি ছাড়া আর একটা চিঠি পাওয়া গেল। চিঠিখানা লিখেছেন রমাদেবী। ভাঁজ করা চিঠির মধ্যে আর একটা চিঠি পাওয়া গেল। তাতে অল্প কয়টি কথা লেখা আছে। লিখলেন সবিতার বাবা।

"বাবা উৎপল বহুদিন থেকে ভেবে আসছি সবিতাকে তোমার হাতে তুলে দেব। আমার পর পারের ডাক এসেছে এবার থেকে ওর ভাবনা তুমিই ভাব। আশীর্বাদ করি। সুখি হও।"

ইতি—

সমীর ঘোষ।

তারপর রমাদেবীর চিঠি পড়ল।

উৎপলকে একটিবার দেখা করার জন্য অনুরোধ করলেন। চিঠি পড়ে উৎপল যেন অবশ হয়ে গেল। মুহূর্তে তার মনের পর্দায় ভেসে উঠল মাসীমার বৈদব্যের রূপ। সবিতা যেন করুণ ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চাহনি যেন উৎপলকে হুল ফোটাচ্ছে—তোমার কি হয়েছে গো? তুমি তো এমন ছিলে না?

একদিকে সবিতা ও রমাদেবীর কান্না অন্যদিকে মুমূর্ষ মানুষটির কাতর আবেদন। সব মিলিয়ে উৎপল কি করবে না করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। তার স্নায়ুকোষগুলো যেন স্থির হয়ে গেছে। কোন কাজ করছে না। ভাবতে ভাবতে বেলা অনেক হল। এ অবসন্নতা, হা-হুতাশ, কি করি না করি ভাব কাটার পর উৎপল বাজারে এল। দোকানটা ঘুরে পরের ট্রেনেই যাত্রা করবে।

হন্তদন্ত হয়ে পা চালাচ্ছিল।

মোড়টা ঘুরতেই উমাবাবুর ট্যাক্সি এসে ধাক্কা দিল। ব্রেক করতে না করতেই উৎপল ড্রেনে ছিটকে পড়ল। হৈ-হৈ করে সবাই

উৎপলকে তুলল। কেউ কেউ ট্যাক্সি ঘিরে জটলা শুরু করল। উমাবাবু ট্যাক্সি করে উৎপলকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। মাথাটায় দারুন লেগেছে। একটা পুরোদিন উৎপলের হুশ ছিল না। তারপর আরো কয়েকদিন হাসপাতালে কাটল।

উমাচরণবাবুর বাড়িতেই উৎপল ভাড়ায় ছিল। উৎপলের পড়াশুনায় আগ্রহ দেখে উমাচরণবাবু খুশি ছিলেন। তারপর অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর কয়েকদিন হাসপাতালে দেখাশুনার মধ্যে উৎপলের প্রতি কেমন একটা মমতা জম্মে গেল। তিনি উৎপলকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলেন এবং ভিতর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করলেন। উৎপলকে আটার ব্যবসা ছেড়ে মন দিয়ে পড়াশুনা করতে উপদেশ দিলেন।

উমাচরণবাবুর একমাত্র কন্যা অনিতা।

উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রী। উৎপল আর সেঁত সেঁতে বাইরের ঘরে থাকে না। একেবারে দ্বিতলে অনিতার পড়ার ঘর দখল করল। অনিতাকে পড়ানো এবং নিজের পড়াশুনাই কাজ। অনিতার বাবা-মার আদর যত্ন এবং অনিতার দুষ্টুমিপনার মধ্যে তার দিন কাটতে শুরু করল। কলেজের ফাঁকে ফাঁকে সকাল-সন্ধ্যায় অনিতাকে পড়ায়।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর উৎপলের শরীর যেমন দুর্বল হয়েছে তেমনি মনের জোরও কমে গেছে। সবিতাদের সঙ্গে দেখা করা উচিত। যাই যাই করেও আর যাওয়া হল না। বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা! উৎপল নতুন পরিস্থিতির শিকার হয়ে গেল।

অনিতা ট্যাক্সি চালাতে জানে।

বিকেলবেলা অনিতা মা ও উৎপলকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়। মাঝে মাঝে উৎপল আর অনিতা বের হয়। উৎপল সঙ্কোচ বোধ করে। অথচ না গেলেও অনিতা কান্নাকাটি করে বিব্রত করে।

শেষ পর্যন্ত রফা হল দুজনে হেঁটে চলবে। অনিতা তাই তাই মেনে নিল। অশান্ত অনিতা দিন দিন কেমন শান্ত হয়ে পড়ল। ওর বাবা-মা খুশি হয়। অনিতার আচার আচরণে পুরুয়ালি ভাব কমে এল। স্নো-

প্রসাদনের প্রাচুর্যে যে অনিতায় দেহ মন ডগমন করত সে ক্রমেই বুঝতে পারল উৎপল এসব পছন্দ করে না। সুতরাং প্রসাদন তার অঙ্গে উঠা বন্ধ হল। চমৎকার পরিবর্তন। উৎপল মুগ্ধ হয়।

উৎপল আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। তার রাশভারি আচরণে পরিবর্তন এল। অনিতাকে দেখলে তার বুকের রক্ত-মাথার দিকে ছোটাছুটি করে। অনিতাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন নতুন জায়গায় ঘোরে। আগে অনিতা পথ দেখাত এখন উৎপল পথ দেখায়। অনিতা বায়না ধরে উৎপল তা মিটিয়ে দেয়।

মাঝে মাঝে অনিতা উৎপলের পকেটে টাকা রেখে দেয়। প্রথম দিকে উৎপল অবাক হয়ে যেত। অনিতাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় অনিতা খিল খিল করে হাসত। তারপর এক সময় গা-সওয়া হয়ে গেল। উৎপলের হাত খরচের টাকা অনিতা এভাবে যোগান দিত।

অনিতা পড়তে বসে।

পড়ায় মন দেয় না। উৎপল হাতে ছড়ি নেয়। অনিতা ছড়ি ফেলে দেয়। উৎপল ছড়ি খুঁজতে বসে। তখন অনিতা মুখে কাপড় গুজে খিল খিল করে হাসে। উৎপল চোখ রাঙ্গার শাসন করে। কিন্তু অনিতার মমতাভরা চোখের চাহনিতে তার শাসন ক্ষমতা লোপ পায়! শাসন করার পরিবর্তে অনিতাকে কোলে টেনে আলতো করে চুমু দেয়। বুকের রক্ত সমস্ত শিরা-উপশিরার দিকে ছোটে। উত্তেজনার মুহূর্তে দুজনেই ন্যায় অন্যায় বোধ হারিয়ে ফেলে। প্রকৃতিস্থ হলে দেখা যায় দুজনেই লজ্জায় জড়সড় হয়ে আছে। এমনি করে পরস্পরকে ভালবাসে। বাবা মা যে একেবারে কিছু বুঝত না তা নয় তবু কি জানি অন্ধ মায়ার জন্য শাসন করত না।

হেমন্তকাল।

জ্যোৎস্না ভরা রাত। নীল আকাশে তারায় ভরা। মৃদুমন্দ হিমেল হাওয়া বইছে। শীত ঝাকিয়ে বসেনি। হাড় কাপুনে শীত আরো পরে আসবে। সবে শীতের সূচনা। উৎপল কত কি ভাবছিল। জানালার সামনে তন্ময় হয়ে তারা দেখছিল। কী আশ্চর্য এদেশ!

দিনেরবেলা প্রখর রবি কিরণ এদেশের শ্যামল মাকে জ্বলে পুড়ে ছাই করে দেয়। রাতে শুভ্র চাঁদ তার মৃদু স্নিগ্ধ আলোকে ধরাকে ম্লান করে দেয়। হাজার রকম ভাবনায় তার মন ডুবে ছিল। এমন সময় অনিতা ঘরে ঢুকল। পা টিপে টিপে উৎপলের অলক্ষে তার চোখ টিপে ধরল।

—এ কি করছ। দুষ্টুমি হচ্ছে ?

পাঁচটি নরম আঙ্গুলের চাপ।

উৎপল অনিতার হাতের আঙ্গুলগুলো নিজের হাতে গুজে নিল। তারপর কড়ে আঙ্গুলে আলতো করে চাপ দিল। উঃ! কি শিহরণ।

সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে। কড়ে আঙ্গুলটা সুইচ। ভাল লাগল। খুব ভাল লাগল। হাত সরাতে ইচ্ছা হল না। নারী লজ্জা ঘিরে ধরল। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃদু প্রতিবাদ করল—লাগছে! ছেড়ে দাও।

হাত সরিয়ে অনিতা পালাবার চেষ্টা করল। উৎপল শাড়ি ধরে আকর্ষণ করল।

—উৎপলদা একটা কথা বলবে ?

—কি ?

—এতক্ষণ কি ভাবছিলে ?

—কেন ? এত সুন্দর আলো ; আকাশের তারা।

—বাজে কথা।

—সে কি! আমার কল্পনার জগত বাজে ?

—আমি জানি ওটা ঠিক নয়। যা জিজ্ঞেস করি তাই বল।

—কি বলব ?

—বল, তুমি কাকে ভালবাস ?

—ও তাই বল। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?

—এমনি জানতে ইচ্ছা করল।

—বেশ, যদি প্রশ্ন করি তুমি কাকে ভালবাস ?

—আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

উৎপল মুচকি হাসল। বেশ যদি বলি—তোমাকে।

লজ্জা আর খুশিতে ভরে যায় অনিতার সুন্দর মুখখানা।

—ধ্যাৎ...

হাতে একটা ঝাকুনি দিয়ে ঘর হতে পালাল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা উৎপল অনিতা পড়তে বসল।

উৎপল কয়েকটা ট্রান্সস্লেশন করতে দিল। অনিতা পারল না। পড়া না পারলে উৎপলের ভারী দুঃখ হয়। আজ আর হাসি নয়। সপাৎ করে ছড়ির আঘাত করল। ধমক দিল—দুষ্টুমির বেলা শিরমণি পড়ার বেলা ঠুটো জগন্নাথ।

ভারি অভিমান হল।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে বসল অনিতা।

অ্যা—অ্যা—আমায় মেরেছে উৎপলদা। অ্যা—অ্যা—আমি আর পড়ব না।

চোখে নেই যত জল তার চেয়ে চোখ রগড়াল বেশী। ততক্ষণে উৎপলের রাগ পড়ে গেছে। ভাল লাগল অনিতার সোহাগভরা কান্না। অনিতার প্রতিটি হাসি কান্না ব্যবহারের মধ্যে উৎপল কি যেন একটা তৃষ্ণা মিটিয়ে নিল। অনিতার মন ভোলানো হাসির মধ্যে উৎপল কখন নিজেকে হারাল টের পেল না। আবার আদর করল। পড়াল। পড়ার শেষে অনিতা উৎপলের বই পুস্তক পোষাক পরিচ্ছদ সাজিয়ে রাখল।

উৎপল দেখে মুগ্ধ হল।

উমাচরণবাবুর বাড়ি আসার পর উৎপল সবিতাকে অনেক চিঠি লিখেছে। কিন্তু তার কোনটার উত্তর পায়নি। কয়েকটা চিঠির উত্তর না পাওয়ার পর উৎপল ভাবল সবিতারা হয়তো কোথাও গেছে। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। সবিতা সব চিঠির জবাব দিয়েছিল। এসব চিঠি অনিতার হাতে পড়ত। উৎপলকে হারাবার ভয়ে এগুলো চেপে রাখত।

এর মধ্যে একটা চিঠি উৎপলের হাতে পৌছাল। সে চিঠিতে

সমীরবাবুর মৃত্যু সংবাদ ছিল। সবিতার বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দেখা করার জন্য বাড়ি যাচ্ছিল উৎপল। কিন্তু ট্যাক্সির ধাক্কায় অচৈতন্য হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হল। সেখান থেকে ফিরে অনিতার মায়াজালে পড়ল। এভাবে সব ভুলল।

এমনই ঘটে।

বাস্তব এতই নির্মম সত্য। মানব চরিত্র এতই চঞ্চল। যে উৎপল একদিন সবিতাকে ছাড়া বাঁচার কথা ভাবতে পারত না। সে সবিতাকে উৎপল ভুলল। কিন্তু বিধাতার কাজ বিধাতা করেন, নর-নারী তার মর্মকথা বোঝে না। মানুষ অতীতের সুখ দুঃখকে কালের গর্ভে ছেড়ে দিয়ে বর্তমানের সুখে মজে যায়। অতীত হতে কোন শিক্ষা নেয় না। এই তো মানুষের জীবন!

মানুষ অতীতকে ভোলে কিন্তু কাল তা ভোলে না। মহাকাল এ-কাহিনী পুঞ্জ নিজের বুকে লিখে লিখে ইতিহাস সৃষ্টি করে। সময় মত ন্যায় অন্যায় বিচার করে ফলাফলের দণ্ড বিধান করে। অর্থাৎ ইতিহাসের অমোঘ বাণী মানুষের ভাগ্যলিপি হয়ে দাঁড়ায়। উৎপল অতীতকে ভুলেছে তাই ভবিষ্যৎ কালের কাছে তার কৃতকর্মের দণ্ড মাথায় পেতে নিতে হবে। ঠিক হলও তাই। অনুশোচনার জ্বালাকে এড়াতে পারেনি।

শীতকাল।

উমাচরণবাবুর এ বাড়িতেই উৎপল একটা শীত কাটিয়েছে। আজ আর এক শীতের বিকাল। উৎপলের মনে জেদ চেপেছে। সে ট্যাক্সি চালনা শিখবে। শিখবে অনিতার অজান্তে। অনিতাকে চমকে দেবে বলে। এজন্য মনের আনন্দে হেঁটে চলেছে।

উৎপলের মনের আশা মিটল না। বিধাতা বাদ সাদলেন। ট্যাক্সি চালাতে গিয়ে গিয়ার কনট্রোল করতে পারল না। ট্যাক্সি একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেল। ফলে হাত ভাঙ্গল।

মুনিবর কালের চরম প্রতিশোধ!

তারপর উৎপলের কি হল ঠিক মনে নেই।

ট্যাক্সি চালনা যারা শেখাচ্ছিল তারা উৎপলকে ডাক্তারখানায় নিয়ে এল। যখন ভীড় কমল দেখল তার হাত ব্যাণ্ডেজ করা। হাতের এ অবস্থা দেখে উৎপল আঁৎকে উঠল। ডাক্তার যেন অভয় দিলেন।

—ডোণ্ট কেয়ার মাই বয়; ইউর কেস ইজ নট সো ডেনজারাস্। আই উইস ইউ উইল কিউর ভেরি আরলি।

ডাক্তার অভয় দিলেন বটে। কিন্তু উৎপল মহাচিন্তায় পড়ে গেল। অনিতার কথা মনে পড়তেই শিউরে উঠল।

—উঃ! ভগবান। ওকি আমার দিকে ফিরে তাকাবে?

মনে মনে অনুশোচনা আর আত্মগ্লানিতে নিজেকে ধিক্কার জানাল। হায়! একি করলাম।

এমন সময় ডাক্তার সেন জানতে চাইলেন।

—কি নাম বাবা? থাকো কোথায়?

ঠিকানার কথা শুনে উৎপলের গলা শুকিয়ে গেল। কি উত্তর দেবে উৎপল? অনিতা এ অবস্থা দেখবে? কি লজ্জার বিষয়। উৎপল ভাবছিল। দেরী দেখে ডাক্তারবাবু তাড়া দিলেন।

—এনসার কুইকলি মাই বয়; আই অ্যাম এনগেজড উইথ এ কল।

সঙ্গের ছেলেটি উত্তর দিল।

—উৎপলদা উমাবাবুর বাড়ি থাকেন। অনিতাকে পড়ান।

ও—আই সী ইউ আর লজিং মাষ্টার। বাট হোয়াই আর ইউ স্টপিং?

ফোন হাতে নিলেন ডাঃ সেন। ডায়ালটা ঘুরিয়ে দেবার পর ক্রিং ক্রিং শব্দ হল।

—হ্যাঁ…হ্যাঁ…

ওপার হতে উত্তর এল।

—কাকে চাই?

—আই ওয়াণ্ট উমাবাবু।

—আপনি ডাক্তার কাকা?

—ইয়েস মাই গার্ল।

—কাকাবাবু, বাবা যে বাড়ি নেই।

—শোন, তোমার মাষ্টার উৎপলের অ্যাকসিডেন্ট।

আমার কাছেই আছে।

—অ্যাঁ···ক···সি···ডেণ্ট।

খট করে একটা শব্দ হল।

তারপর আর কোন শব্দ নেই। ডাক্তার সেন আর কোন বলতে পারলেন না।

অ্যাঁকসিডেণ্ট···অ্যাঁকসিডেণ্ট···।

অনিতা ছুটে বের হল। আজ যে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। পাশের ঘর থেকে মা কন্যার ব্যস্ততা দেখে বের হল।

—কিরে অনি! কার অ্যাঁকসিডেণ্ট?

মা ত্রস্ত।

ততক্ষণে গ্যারেজ থেকে ট্যাক্সি বের হয়ে গেছে। দ্বিরুক্তি না করে মাও মেয়ের পাশে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্যাক্সি এসে থামল ডাঃ সেনের ডিসপেনসারিতে।

মাও মেয়ে অনুপূর্বিক ঘটনা শুনল।

ডাক্তার সেন অনিতাকে একান্তে ডেকে কি যেন বললেন। উৎপলকে বাড়ি নিয়ে আসা হল।

হাত ভাঙ্গার পর অনিতার চোখে ঘুম নেই। মনের মানুষ উৎপলের সেবা যত্নে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। রোগীর যত্ন নেওয়া। রোগীকে সময় মত ঔষধ খাওয়ানো প্রত্যেকটি কাজ নিজ হাতে করল। রাত জেগে রোগী পাহারা দেয়। মাকে সঙ্গে নিয়ে এসে রোগী দেখে যায়। ভাবে কোথাও যত্নের ত্রুটি হচ্ছে নাতো! আর মনে মনে খুশি হয়—এমনি রাত জেগে সেবা যত্ন করে সে উৎপলের মন জয় করবে। কোন মতেই তাকে সবিতার হাতে ছেড়ে দেবে না। এমনি করেই সে সুখে দুঃখে উৎপলের চির সঙ্গীনি হয়ে থাকবে।

হায় বিধাতা!

মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। ভূতুম পাখির ডাকে অনিতা এ

জ্যোৎস্না রাতেও ভয় পেল। এ সুখ চিন্তার মধ্যে ভূতুম পাখিটা ডেকে ডেকে কি তাকে ব্যাঙ্গ করছে!

—হ্যাঁ, একদিন উৎপল হয়তো আমাকে ভুলেই যাবে। আর তার স্থান নেবে সবিতা।

কিন্তু সবিতা কে? কি করতে পেরেছে সে উৎপলের জন্য? হ্যাঁ আজ আমি যা করছি হয়তো উৎপলের কাছে একদিন তা অভিনয় মনে হবে। কিন্তু অন্তর্যামী তুমি জান আমি মনে প্রাণে কর্তব্য মনে করেই করেছি। আমি পবিত্র থাকতে চাই। উৎপলকে সরিয়ে নিও না। তাহলে আমি বাঁচব না। যদি উৎপল না থাকে আর আমি সহ্য করতে না পেরে পঙ্কিলে ডুবি তাহলে কি আমার দোষ হবে?

ওগো বিবেক তখন আমায় কি দণ্ড দেবে?

ওগো সমাজ সেদিন আমায় কি বলে আখ্যা দেবে?

সেদিন আমার মনের কথা কি জানতে চাইবে!

কত তাত্বিক কথাই না অনিতা ভাবল আর মনের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এক সময় তন্দ্রায় তলিয়ে পড়ল। কোন ফাঁকে যে উৎপলের পাশে শুয়ে পড়ল নিজে টের পেল না। সকালে বাইরের শব্দ পেয়ে জেগে উঠল। নিজেকে এ অবস্থায় দেখে খুব লজ্জা পেল। শুধু তাই নয় রাতে কে একটা কম্বল চাপিয়ে দিল। নিশ্চয় উৎপল। ছি!

কেন যে ঘুমটা এল! মাও তুলে নিয়ে গেল না। সমস্ত লজ্জা অনিতাকে ঘিরে ধরল। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বের হল।

একমাস বিছানায় শুয়ে, বসে, কাটিয়েছিল উৎপল। এর মধ্যে অনিতা অনেক যত্ন করেছে। অনিতা যত যত্ন করেছে উৎপলের মনে তত এক নতুন যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়েছে। মুখ খুলে কিছু বলতে পারল না। নিজেকে অপরাধী মনে করল। ভাবল অনিতা তো জানে না; যে সে সবিতার প্রিয়জন।

বিবেক দংশনে কষ্ট পাচ্ছিল উৎপল। সবিতার কথা বেশি করে মনে পড়ল। সবিতার বিপদে সে এমনি সেবা করেছিল। পুরানো ছবি উৎপলের মনে ভেসে উঠল। প্রিয়জন দূরে থাকলে তার গুরুত্ব টের

পাওয়া যায়। দূরত্ব আর সময়ের ব্যবধান প্রিয়জনের কথা ভাবায়। স্মৃতিটা মাঝে মাঝে জ্বালা দেয়। দুঃখ যেন বেশি করে অনুভূত হয়।

বাড়ি থেকে চলে আসার পর প্রথম দু-তিন মাস এমনি কষ্ট পাচ্ছিল। তারপর আস্তে আস্তে সব সয়ে গেল এবং বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে উৎপল অসহায় হয়ে পড়ল। তারপর অনিতার প্রেম জালে পড়ে সব ভুলতে বসল।

হাত ভাঙ্গার পর দীর্ঘ অবসরে অতীতের ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেল। আর তখনই বুঝতে পারল উৎপল নিজের ভুল। তার অর্থ নৈতিক দুর্বলতার কারণে অনিতাকে প্রায় দিয়েছিল। এভাবে নিজের অপরাধের পরিমান যেমন বাড়াল তেমনি অনিতা-সবিতার প্রতি নীতি-হীন আচরন করল। অনিচ্ছা সত্বেও উদ্ভুত ঘটনার শিকার হল। কিন্তু আর নয়। নিজেকে শোধরাতেই হবে।

হাত ভাল হওয়ায় উৎপল খুশি।

খুশি অনিতাও। উৎপল বলল।

—আমি ভাল হয়েছি অনিতা। আবেগ কণ্ঠে বলল, আমি তোমাদের কাছে কত ঋনী !

পরম শান্তি ! এ একটি কথায় অনিতা কত খুশি হল। করজোড়ে গৃহদেবতার কাছে প্রার্থনা জানাল।

—সুখে দুঃখে উৎপলের পাশে থাকতে দিও প্রভু।

খুশীর বন্যা ওর মন ভরে দিয়েছে। অনিতা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না।

—পুরানো দিন ফিরেছে বুঝি ! এবার বেশ মজা হবে, নতুন ড্রাইভার পেয়েছি যখন !

অনিতা খিল খিল করে হেসে উঠল। অনিতার প্রাণখোলা হাসি দেখে উৎপল লজ্জায় পড়ে গেল। উদপল গম্ভীর হয়ে গেল দেখে অনিতা ও চুপ করল এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—এমন রসিকতা আর করবে না।

একটা বিষন্ন,"বিরক্তির ভাব উৎপলের চোখে মুখে ফুটে উঠল। যে

অনিতার কথায় প্রতিটি কাজের ছোঁয়ায় উৎপলের শিহরন জাগত; পলকে পলকে প্রেমের স্পর্শ অনুভব করত ; সে অনিতার রসিকতা আজ আর ভাল লাগল না।

আসলে উৎপল জীবনের চরম সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। এজন্য এত গম্ভীর। ভাবছে সবিতা তারই পথ চেয়ে বসে আছে। শত দুঃখ ও অর্থনৈতিক গ্লানিকে হাসিমুখে জয় করে শুধু তারই আশায় বসে আছে। ফিরিয়ে দিয়েছে বাপ-মার পছন্দ করা বর। আর এযে অনিতা সেই বা কি দোষ করল? সেও তো তাকে মন প্রাণ দিয়েছে।

হ্যাঁ ভুল হয়েছে তার প্রথম থেকে সাবধান না হওয়া। সাবধান হলেই বা কি? তাহলে হয়তো অনিতার বাবা-মার কাছে মাথা গোজার স্থানটুকুও হত না।

এখন সে কি করবে?

জনম দুঃখিনীর দুঃখে সাড়া দেবে না সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো অনিতাকে বরণ করবে? ভাবতে পারে না উৎপল। উৎপল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে চাইল না। কিন্তু মানবতার দিক! সে যে সবিতাকে কথা দিয়েছে। মনে পড়ে শুক-সারির কথা।

তাছাড়া মুমূর্ষ পিতার কন্যা সমর্পণ।

সমীরবাবুর চিঠি তো চিঠি নয় ওটা তো কন্যা সমর্পণের দলিল। না। উৎপল ভাবতে পারে না। কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত। উৎপল সিদ্ধান্ত নেয় এ মুহূর্তে তার একটাই কর্তব্য সবিতার বর্তমান পরিস্থিতি জানা এবং তাকে নিজের পরিস্থিতির কথা জানানো। হয়তো সবিতাই দেবে পথ নির্দেশ। আবার ভাবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বা বিচার করবে না কেন? অর্থ না থাকলে সবই অনর্থ। এই যে ধনীর দুলালী অনিতা, বাবার টাকার সুখে লালিত-পালিত হচ্ছে। আবার বাবার অর্থেই মনের মানুষকে সুখে রাখার চেষ্টা করছে। এর মূল্য কতটুকু?

আজ যদি অনিতা স্বপ্নের ঘোরে, উপার্জনহীন স্বামীর ঘর করতে আসে তা হবে প্রেমের অঙ্গিকার রক্ষা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, সংসার

জীবনে অর্থ ছাড়া এক পাও এগোনো যাবে না। তখনও অনিতা নিখাদ প্রেম বিলাতে পারবে? ধনীর দুলালীর এত কষ্ট সহ্য হবে কেন?

অন্যদিকে সবিতা আজন্ম দুঃখিনী। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠেছে। দু-চারটা টিউশনি করেও সংসার নির্বাহ করতে পারবে। অল্পেই সে সুখী হবে। ওর চাওয়া-পাওয়া খুব সামান্য। অনিতা তার বিপরীত। তার চাওয়া-পাওয়া অনেক বেশি। অনিতার উপার্জনহীন স্বামী যদি তা মেটাতে না পারে তবে মরুভূমির মাঝে তৃষ্ণিত প্রাণের মত সে ছট-ফট করতে থাকবে। আর একটু একটু করে শুকিয়ে যাবে আজকের গড়া প্রেম ভালবাসা। প্রেমহীন জীবন তো মৃত্যুরই সামিল।

হে মুনিবর কাল তোমার বিধান কি ফলতে শুরু করল? না হয় উৎপলের মনে এত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কেন? অনিতা যত বেশি করে পাওয়ার চেষ্টা করছে, সবিতার কথা তত বেশি উৎপলের মনে পড়ছে। একই আকাশে সূর্য যেমন নিজের সহস্র আলো রশ্মি দিয়ে চাঁদের আলোকে ঢেকে দেয় তেমনি অনিতার ভালবাসাকে ছাপিয়ে সবিতা স্ব-মহিমায় উৎপলকে আকর্ষণ করল।

একটা বিষণ্ন নীরবতা ঘরে নেমে এল।

এমন সময় অমলেশ ঘরে ঢুকল। অমলেশ প্রায়ই উৎপলের খবর রাখে। আজ বন্ধুকে সুস্থ দেখে হাঁক-ডাক শুরু করল। হাঁক-ডাক শুনে অনিতার মাও এলেন। তিনি বল্‌লেন।

—উৎপল তোমরা বাইরে থেকে ঘুরে এস।

অমলেশ বল্‌ল।

—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা চলুন সবাই ঘুরে আসি।

'আমি যাব না'—অনিতা বলল।

—তোমার অসুখ করেছে নাকি অনিতা?

উৎপল উৎকণ্ঠিত হয়।

—না, এমনি ভাল লাগছে না।

অনিতা নীরব।

উৎপলই আর কথা বাড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। মা কেমন অস্বস্তি বোধ করলেন। এমনিই অনিতা উৎপলের ব্যবহারে দুঃখিত হল। তার উপর এ অনাদর দেখে তার শোক দুর্বার গতিতে উথলে উঠল। ঢুকরিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করল।

কিন্তু মায়ের সামনে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে বলে নির্জনে বসে কাঁদল।

কান্নাও কাল মানুষের দুঃখকে মুছে দেয়। সন্ধ্যার পর শুয়ে শুয়ে আরো কাঁদল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুম পেল। স্বপ্ন দেখল। সে এবং উৎপল দুজনে এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারদিকের শোভা নিরীক্ষণ করছে এমন সময় অনিতা পা পিছলে পড়ে গেল। অনিতা ঘুরে পড়ছিল আর সাহায্যের জন্য উৎপলকে ডাকছিল। কিন্তু উৎপল শুধু বোকা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

অনিতার গোঙানি শুনে মা ছুটে এলেন! অনিতা মাকে ধরে হাঁপাচ্ছিল এমন সময় টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল। মা ফোন ধরলেন। ওপার হতে উৎপলের কণ্ঠ ভেসে এল। সেই বিকেলে উৎপল এবং অমলেশ দু-বন্ধু বেরিয়েছিল। কথায় কথায় একটু রাত হল। আসার পথে উমাচরণবাবুর গদিতে সবিতার একটা চিঠি পেল। উৎপল চিঠি পড়ে অস্থির হয়ে উঠল। বাড়ি যাবে বলে ফোন করল।

—মাসীমা খবর পেয়েছি বাড়িতে খুব বিপদ। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

—একবার বাড়ি এস, তারপর যেও।

—না আমাকে এ ট্রেনটা ধরতেই হবে।

—বেশ, অনিতার সঙ্গে কথা বল।

মা অনিতার হাতে ফোন দিলেন।

অনিতার তখনও স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। তাই ফোন হাতে নিয়ে চিৎকার করে উঠল—উৎপল! উৎপল বলল আমায় ক্ষমা কর।

এখন কথা বলার মত অবস্থা নয়। ফিরে এসে সব বলব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সবিতার বাবা স্বর্গারোহণ করেছেন বৎসরাধিক কাল হয়। তিনি মৃত্যুর সময় পত্র মারফত উৎপলের কন্যা সমর্পণ করে গেছেন।

সেই থেকে পরিবার পরিজনদের ফটোর মধ্যে উৎপলের ফটোখানাও শোভা পেয়ে আসছে। প্রতি সন্ধ্যায় সবিতা সন্ধ্যাবাতি দিতে এসে উৎপলের ফটোর প্রতি একটা দীর্ঘ প্রণাম জানায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার মনোবাসনা পূর্ণ হল না।

পিতৃ-বিয়োগে সবিতা এতটা ভেঙ্গে পড়েনি। কেননা বাবা কন্যা সমর্পণ করে গেছেন। তার ঘর বাধা হয়েছে, শুধু আনুষ্ঠানিক পর্ব সারা বাকি। সুতরাং তার বুকে বল ছিল, দুজনের ছোট্ট সংসার গড়ে নিতে বেগ পেতে হবে না। এখন শুধু উৎপলের পড়াশুনা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এতএব অর্থ নৈতিক কষ্ট হলেও মনের আনন্দেই দিনগুলো কাটছিল।

কিন্তু একি! একমাস দুমাস করে কতদিন, কত মাস হয়ে গেল উৎপল আসছে না। না আসুক চিঠি তো দিতে পারে। তাও দিচ্ছে না। সুতরাং মনটা বড্ড চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

হবেই তো প্রিয়জন দূরে থাকলে কার না মন চঞ্চল হয়?

কিন্তু তারপর?

তারপর এমন একটা সময় এল যখন সবিতার মন সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল। তবু মন অবিশ্বাসী হতে চায় না। উৎপলের মুখখানা বড্ড বেশি করে মনে পড়ে।

সবিতা নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না! মাঝে মাঝে হতাশা দেখা দেয়। ভাবে একি ভ্রম! অসীম আকাশের বুকে শুভ্র চাঁদে কলঙ্ক আছে কিন্তু তার উৎপলের তো কোন কলঙ্ক নেই। উৎপল তো তাকে কথা দিয়েছে। শুক-সারি তার সাক্ষী। ও কথার মূল্য দেবেই।

না-না সে একি ভাবছে! খামোখা উৎপলের উপর রাগ করে বসেছে।

সবিতা যার জন্য তিনটি বসন্ত বিলিয়ে দিয়েছে সেকি তাকে ভুলতে পারে! নিজেকে সান্ত্বনা দেয় সবিতা—হয়তো তার জন্যই উৎপল কত কষ্ট করছে। কষ্ট করে পড়াশুনা করছে।

মনে কত কল্পনার জাল বুনল সবিতা, উৎপল যেখানেই থাক তাকে ভুলতে পারে না। অনেক পড়াশুনা করে কৃতীমান হয়ে ফিরবে। তারপর এই দীর্ঘ নিরবতার জন্য দুঃখ করে বলবে, "সবি তোমাকে আমি ভুলিনি সময় মত না আসতে পারার জন্য আমায় ক্ষমা কর।"

উঃ!

সবিতার তখন কত লজ্জা হবে।

সে কি বলবে! উচ্ছ্বাসের মাথায় সে কি যে করে ফেলবে! হয়তো হু হু করে কাঁদবে নয়তো অভিমান করে কথা বলবে না।

সবিতার বাবার মৃত্যুর পর সংসারে কত বিপর্যয় এসেছে। সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্যতার মধ্যেও সবিতা কাল্পনিক সুখের আশা ছাড়েনি। আশায় আশায় হৃষ্টপুষ্ট মন নিয়ে বহুদিন কেটেছিল। কিন্তু সবিতার মনে বরাবর একটাই দুঃখ ছিল।

—উৎপল যেখানেই থাক না কেন মাঝে মাঝে একটা চিঠি তো দিতে পারে। উৎপল তা করে না কেন?

হায় সবিতা!

কত বিরহের কান্না কাঁদলে। দিনান্তে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানায়।

—ঠাকুর উৎপলকে সুখে রাখ। ও কৃতীমান হয়ে ফিরে আসুক।

সমীরবাবুর মৃত্যুর ছয় মাস পরেও যখন তুলসী গাছের তলায় গলায় আঁচল দিয়ে হাঁটু গেড়ে নতজানু হয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাত। দাদু বলতেন।

—ঠাকুরের কাছে বল ভাই উৎপল যেন কৃতীমান হয়ে ফেরে।

তখন গোলগাল মুখখানা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে যেত। সবিতা দাদুকে বলত,—দাদু দেবতা শুনছে কৈ? দাদু সবিতার দুঃখ বুঝতেন। কিন্তু দাদু মনের কথা মনে রেখে রসিকতা করতেন।

—হ্যাঁ দাদুভাই মনের মানুষ হঠাৎই ধরা দেয়। সময় হলে এক সঙ্গে অনেক চিঠি দেবে। এত সুন্দর মুখাখানা কি আর ভুলতে পারে!

সবিতা আর কোন কথা বলতে পারত না। একটা ছোট্ট কথা বলে পালত। হ্যাঁ সেও তো ছয় মাস হয়ে গেল। এখন সবিতা একা। সে দাদুও নেই আর মনের মত করে বলতেও পারছে না।

'ফাজি বুড়ো'।

আজ সারাদিন সবিতার মন খাঁ খাঁ করছে। তার কিছুতে ভাল লাগছে না। মনটা উদাসীন হয়ে গেছে। পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজে বহু টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। তারপর দাদুর অভাবনীয় মৃত্যু সবিতার মন ভেঙ্গে দিয়েছে। ছোট্ট সংসারে দারুন বিপর্যয় নেমেছে।

রমাদেবীও স্বামী শ্বশুরকে হারিয়ে ভেঙ্গে পড়লেন। মরু তৃষ্ণার মাঝে আশাপ্রদীপ উৎপলেরও কোন সাড়া শব্দ নেই। রমাদেবী আর পেরে উঠছেন না। ভাবলেন আর নয়। অনেক অপেক্ষা করেছেন আর ভরসা পাচ্ছে না। এ বিপর্যয়ের দিনে উৎপল ভুলেছে। এবার সবিতাকে অনত্র বিয়ে দেওয়া যাক। ওর পথ চেয়ে থাকলে কেবল দুঃখই বাড়বে।

দেখতে দেখতে বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত পার হয়ে গেল। শীতেরও প্রায় শেষ। আসছে ফাল্গুণে মেয়ে বিয়ে দিতেই হবে। রমাদেবী আর কোন বাধাই মানবেন না। টাকা পয়সা সবই ফুরিয়েছে এমন অবস্থায় আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে নিঃস্ব হয়ে পথে বসতে হবে। অতএব রমাদেবী বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। দু-এক জায়গা থেকে পাত্রপক্ষ পায়ের ধূলোও রেখে গেছেন। লোক হিসাবে মন্দ নয়।

জামাই হলে মেয়ে সুখেই থাকবে। তারা পছন্দ করে গেছে। এখন মেয়ের মত হলেই হয়।

শীতের শেষ।

এবার ঋতুরাজ বসন্ত নিজের স্ব-মহিমা নিয়ে আর্বিভূত হলেন। কোকিলের কুহুধ্বনি শুনে সবিতার কত কথা মনে পড়ছে। সেই

প্রতিশ্রুতির কথা মনের কোণে রূপালি পর্দার মত ভেসে উঠে। এমনি এক বসন্তে উৎপল তাকে কথা দিয়েছে। সেদিন শুক-সারি ছিল সাক্ষী। আজ আবার বসন্ত এসেছে কিন্তু উৎপল কোথায়? বসন্ত আজ তার মন মাতায় না কেন?

মন বলে আরো অপেক্ষা কর।

মা বলেন না আর নয়। আঃ! পোড়া কপাল।

মার-ই বা দোষ কি?

উৎপল একটা চিঠি পর্যন্ত দিচ্ছে না। মা কি করে বিশ্বাস রাখতে পারে? হায়! অর্থের অভাবে মাকে কত কষ্ট পেতে হচ্ছে। মায়ের কষ্টের কথা ভেবে তার চোখের জল টপ টপ করে ঝরে পড়ল।

কোথা হতে রমাদেবী এসে রাগে ফেটে পড়লেন।

—কাঁদ পোড়ামুখী, কান্নাই তোর জীবনের সম্বল। হাড় জ্বালালি আমাকেও জ্বালাবি নিজেও জ্বলবি!

মা সন্তানের জ্বালা বোঝেন তাই তাকে বোঝালেন।

—দেখ মা আর পাগলামি করিসনে, দেখছিস তো আমার অবস্থাটা! তাছাড়া তোর পিছনে আর একটা ভাই রয়েছে তারই বা কি হবে?

কথাগুলো বলে মা মেয়ের মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলেন। চোখের পাতা পড়তে না পড়তে মেয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল। মা ভুলটা বুঝলেন। ঘরটা কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মাও মেয়ের দীর্ঘশ্বাস অবুঝের মত লড়াই করছে। আর চোখের চাহনিতে মনের কথা ব্যক্ত করছে। সবিতার দৃষ্টি কখনো কাঙ্গালবেশে মায়ের পদতলে লুটছে। তার চাহনি কখনো দরদ, কখনো রাগের প্রতিনিধিত্ব করছে।

মায়ের দৃষ্টি তারই জবাবে কখনো শাসন করছে, কখনো বলছে— আমি তোর দুঃখিনী মারে!

এক সময় রমাদেবী নীরবতা ভাঙ্গলেন। তিনি শুধালেন।

"দেখ মা উৎপল আমাদের ভুলে গেছে। পোড়া কপাল! সে কি আর তোকে ভালবাসে?"

আর সহিতে পারল না সবিতা। মায়ের গলা ধরে কান্নায় ভেঙ্গে

পড়ল।

"মাগো! আমায় সাগরজলে ভাসিয়ে দাও। তবু পরের গলায় মালা দিতে বল না। হিন্দুর মেয়ের ক'বার বিয়ে হয় মা? আমাদের তো মনের বিয়ে হয়ে গেছে। তবে কেন আমায় এসব বলছ! আর কিছুদিন অপেক্ষা কর মা, আমার মন বলছে ভগবান আমাদের দিকে ফিরে তাকাবেন।"

সনাতন মনে আঘাত পড়ল। মা আর কোন কথা বলতে পারলেন না। মা ও মেয়ের উষ্ণ চোখের জলে দুঃখ কিছুটা লাঘব হল।

গ্রীষ্মটা ভালোয় ভালোয় কাটল। কিন্তু শ্রাবণের অবিশ্রান্ত জলধারা সবিতার দুঃখ দারিদ্র্যের প্রতি একটুও করুণা করল না। ঝড় জল মানুষের সুখ-দুঃখ বোঝে না। ধনীদের উপকার আর গরীবদের অপকার করতেই বুঝি প্রকৃতি ভালবাসে। বর্ষার অবিশ্রান্ত জলধারা সবিতাদের ঘরের মেঝেতে ঢেউ খেলল। শেষ পর্যন্ত আসবাব-পত্র রক্ষা করা দায় হয়ে পড়ল। টুপ-টাপ জলের ফোটা বোধ করি সবিতার অফুরন্ত ভালবাসা ও সতীত্বকে ব্যাঙ্গ করছে। শরৎকাল ও অসহায় সবিতার বুকে আর একটা শেল মারল।

আঃ! কী অপূর্ব ঋতু শরৎ।

অথচ এ শরৎ ধনীদের দেয় অঢেল আনন্দ। আর গরীব! তাদের জন্যই যত রোগ শোক। নয়তো আশ্বিনের শেষার্ধে রমাদেবী রোগে আক্রান্ত হলেন কেন? সবিতা মনের শোক তাপ যন্ত্রণা প্রকৃতির উপর ছেড়ে শান্ত হবার চেষ্টা করে।

অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় রোগটা ক্রমে বেড়ে গেল। ম্যালেরিয়া রোগ। সবিতা একটা কাঁসের থালা ও একটা ঘটি বিক্রি করে মাকে ডাক্তার দেখাল। ডাক্তার কি আর গরীবদের জন্য। অল্প পয়সায় তারা ভাল ঔষধ দেবে কেন? তাই কার্ত্তিক মাসের শেষ অবধি রোগটা গড়িয়ে গেল।

হাসপাতালের চিকিৎসায় ভাল হল ঠিকই। কিন্তু সর্দ্দি কাশির অসুখে রমাদেবী কাবু হয়ে গেলেন। এমনিতে শরীর দুর্বল। তার উপর

সর্দ্দি-কাশিতে কষ্ট পাচ্ছেন। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তার উপর হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

হেমন্তের শেষার্ধে একদিন সবিতা মায়ের পাশে বসে ভাবছিল। বাইরে শুভ্র চাঁদের আলোয় নিশাচরেরা ডানা মেলে পারাপার করছিল।

ঘরে জ্যোৎস্না ঢুকে পড়ল। জ্যোৎস্না যেন শয্যাশায়িত রোগীনি এবং দুর্ভাবনা গ্রস্ত কুমারীর কাহিল অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়াল। সবিতা চাঁদের আলোয় এক ডোজ মিকচার এনে মায়ের মুখের কাছে ধরল। রোগীনি সবিতার হাত ঝাঁকুনি দিয়ে ঔষধটা ফেলে দিলেন।

—তোর হাতে ঔষধ খেয়ে আমার কিছু হবে না। কুলাঙ্গার মেয়ে আমি মরলেও শান্তি পাব না! মিকচার খেয়ে ঘেন্না ধরেছে। তুই মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস তবে কি আমি এত কষ্ট পেতাম। দূর হয়ে যা লক্ষ্মী ছাড়া মেয়ে।

মায়ের রাগ যে কোথায় সবিতা বোঝে।

—মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হতাম মায়ের বিশ্বাস-এ বিপদের দিনে কত টাকা-পয়সা উপায় করে দিতাম। মেয়ে হয়েছি তাই মায়ের গলার বোঝা হয়ে রইলাম। মায়ের উপকারে এলাম না।

রমাদেবী দুর্বল স্থানে আঘাত হানলেন। এ ব্যঙ্গ, •এ অবহেলা, এ তিরস্কার সবিতা সইতে পারল না। তবু হঠাৎ অবুঝের মত কিছু করল না। মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মায়ের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। মাতৃ হৃদয় অতি কোমল স্থান। শেষবারের আবেদন। ব্যথাতুর অসহায় মেয়ের এ ছাড়া আর কিইবা করণীয় আছে! বলার কোন ভাষা নেই। কান্নাই তার ভাষা।

"সরে যা পোড়ার মুখী।"

রমাদেবী মেয়েকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলেন। মাতৃ হৃদয় কষ্ট আর যন্ত্রণায় যার বুক বিষিয়ে গেছে তার কাছে মাতৃ হৃদরের আশা! যন্ত্রণা আর দারিদ্রতার রূপ যারা দেখেছেন তারাই ভাবুন রমাদেবীই বা কি করতে পারেন?

কিন্তু দুঃখিনী সবিতা!

তার মনের অবস্থা কি রকম দাঁড়াতে পারে একবার ভাবুন। তার শোক দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লতার মত জড়িয়ে ধরল মায়ের পায়ে। উষ্ণ জলে মায়ের পা ধুয়ে দিল তবু রমাদেবীর রাগ পড়ল না। সবিতার বাহুতে লাথি মেরে সরিয়ে দিলেন।

"এক পয়সার মুরদ নেই আদিখ্যেতা!"

যে মেয়ে রোজগার করে না সে কি পিতামাতার সন্তান নয়? রমাদেবী সবই বোঝেন তবু কেন অন্তরের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছেন?

আহা!

মনে কত দুঃখ পেল সবিতা। না, এ জীবনে বেঁচে থেকে লাভ কি? মায়ের কোন উপকারে আসলাম না। ভাইকে পড়াবার একটা ব্যবস্থা করতে পারলাম না। এ যন্ত্রণার চেয়ে মরা ভাল। মৃত্যুই বুঝি সব কিছুর শেষ, সব কিছুর আশ্রয়। না, সবিতার মন কোন প্রবোদ মানতে চায় না! তার মন বোবা কান্নায় সুতীব্র চিৎকার করে বলছে, মেয়ে হয়ে বোঝা হলাম। না আর বাঁচতে চাই না। আবার মন হতে উত্তর এল —এত রূপ, এত গুণ; বাঁচতে হবে।

ছাই রূপগুণ!

যে রূপগুণ উৎপলকে ঘরে ফেরাতে পারল না। তার কি মূল্য! না—না আর নয়। উৎপল ভুলেছে। মিছে আশা! মায়ের কথাই ঠিক। পুরুষের মন কচুপাতার জলের মত টল-মল করে। মরীচিকার পিছনে আর ছুটব না। মৃত্যুই সুন্দর। এ পথে কোন বাধা নেই সব হলাহলের অবশান। সবিতা স্থির সিদ্ধান্ত নেয়!

—এ পথেই সব জ্বালার অবসান হোক।

নিশুতি রাত।

রাত এক প্রহর। চারদিক নিশ্চুপ। সাড়াশব্দহীন আলোময় পৃথিবীকে মনে হয় যেন মায়ার রাজ্য। এত আলো। অথচ এ আলোই যত ভয়ের কারণ। কলাগাছের পাতা দুল্‌লে মনে হয় সাদা শাড়ি পরা দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় সবিতার চাঁদের আলোয় এ ধরণের কত অনুভূতিই না জন্মাত। আজ তার কোন অবকাশ নেই।

মন আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। চাঁদের আলোয় মাকে দেখে নিল. মা ঘুমোচ্ছেন। মাকে একটা প্রণাম করল। তারপর ভাইকে ঘুমের মধ্যে আদর করল। চুমু খেল। তারপর স্বর্গীয় বাবা ও দাদুকে প্রণাম করল। বারান্দায় অশীতিপর বৃদ্ধা ঠাকুরমা ঘুমোচ্ছেন। বুড়িকে দেখে যেন হিংসাই হল। বুড়ি যেন সব মৃত্যুয় সাক্ষী হবার জন্য বেঁচে আছেন। বাবা গেলেন, দাদু গেলেন, মাও তাদের অনুসরণ করতে বসেছে। আর সে নিজে! তার তো বাঁচার কোন অবলম্বনই নেই। থাক বুড়ি বেঁচে থাক।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ঝুলানো ছবিগুলোর দিকে। ফ্রেমে বাঁধা একটা ছবি তুলে নিল। এবং নিঃশব্দে ঘর হতে নিক্রান্ত হল। রান্নাঘরে ঢুকল। খালি কলসিটা কাঁকে নিল। সদর দরজা দিয়ে বাড়ির থেকে বের হল রাস্তার তালগাছ তলায় ফটোখানা প্রাণভরে দেখল। চোখের উষ্ণজল গণ্ড বেয়ে নামল। ফটোখানা বুকের উপর চেপে ধরে কত কি বলল, সবিতাই জানে। অতঃপর ফটোখানা গাছের গোড়ায় রেখে নতজানু হয়ে প্রণাম করল, এবং খালি কলসি নিয়ে মিত্রদের পানা পুকুরের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

ক্র···ক ··ক্র···অ···

একটা অজানা পাখি তীব্র চিৎকার করে উঠল। পাখির ডাকে আৎকে উঠল সবিতা। তার বুকটা ধুক ধুক করে উঠল।

ভয়!

কেন? যার মৃত্যুই কাম্য তার ভয় কিসের?

প্রাণটা বেইমানি করছে। যেন বলছে না, না, মৃত্যুর পথ কেন? এত সুন্দর আলো বাতাস, সৃষ্টির রহস্য কত কি জানার কত কি শেখার রয়েছে। আর কারুর জন্য না হোক, এদের জন্য তো বাঁচতে হবে। মুহূর্তে সবিতা দৃঢ় হল। না, এত সব পাওনা আর কারুর হতে পারে তার নয়।

সে যে নিরুপায়। অসহায়।

তার একটি মাত্র পথ। আবার এগিয়ে চলল। পুকুর পাড়ে এসে

দাঁড়াল। দারুণ শীত করছে। কাঁপছে। তবু এক গলা জলে নামল। শীত আরো বেশি করে ধরেছে। আর সহ্য হয় না। এমন সময় পাখিটা আবার চিৎকার করে উঠল।

—ক্র··ক···ক অ। গাছের ডালে ঝাপটা ঝাপটি করল। পাখিটা যেন সবিতার উদ্দেশ্য বুঝে তার ভাষায় প্রতিবাদ করল।

সবিতা ভয় পেল।

কলসিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জলে। উঃ! প্রাণটা যায় না কেন? মরণ কি এত সোজা!

প্রাণটা যেন চিৎকার করে বলছে, না আমি তোমার দেহ ছাড়ব না।

অন্যদিকে উৎপল এগারটার ট্রেনে এল। পথে পুরানো সহবন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল। কথা বলতে বলতে রাত বেড়ে গেল। আমরা জানি একমাস পর উৎপল রোগ শয্যা ত্যাগ করেছে। যন্ত্রণার কষ্টি পাথরে উৎপল নিজেকে জানতে শিখল। সবিতাকে নতুন করে চিনল। তার পর ভাগ্যক্রমে সে দিনই সবিতার পত্র পেল। পত্রপাঠ মাত্র উৎপল সবিতাদের বাড়ির দিকে ছুটল।

রাত এক প্রহর।

সবিতাদের বাড়ি চোখের দৃষ্টিতে পড়া মাত্র কেমন অজানা সঙ্কোচে নিজেকে ভারি মনে হল। ভাবল সবিতা কোথায়? সবিতা যদি সব ভুলে যায়! হয়তো সবিতা চিনতেই পারবে না। তাছাড়া এত রাতে ওর মাই বা কি মনে করবেন? এমনি নানান ভাবনায় তালগাছটির গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

না, বাড়ি ঢোকা ঠিক হবে না। এই ভেবে পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ কি একটা বস্তু পায়ে লাগল। এক পাটি চটি। উৎপল কৌতূহল দৃষ্টিতে চারদিক নিরীক্ষণ করল। দেখল পেছনে কি একটা বস্তু চক্‌চক্ করছে। বস্তুটি আর কিছু নয়—উৎপলের ফটো। নিজের ফটো এবং কোন মহিলার এক পাটি স্যানডেল দেখে উৎপলের মনপ্রাণ অজানা বিপদের সঙ্কেত গেল। মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠল। চোখ দুটো চকিত চমকে চারদিক নিরীক্ষণ করল। শব্দগ্রাহী কান

ছুটো কাছে ধারের কোন শব্দ সংগ্রহ করতে পারল না। কারণ সব নিস্তব্ধ।

চলমান পা ছুটো সামনের দিকে এগিয়ে গেল। সমস্ত দেহ মুহূর্তে বিপদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হল পুকুরের ঘাটে ছুটল। এখানে কেউ নেই। দমবন্ধ করে শব্দ শোনার চেষ্টা করল। চোখ দিয়ে উষ্ণ জলের ধারা বের হবার উপক্রম হল। হায়! হায়! কি হল?

সবিতা! সবিতা তুমি কোথায়?

তুমি দেখা দাও। আমাকে উপযুক্ত শাস্তি দাও। উঃ। প্রাণে যেন কেউ বার বার কষাইয়ের মত কুঠারাঘাত করল। বিপদাপন্ন হরিণশিশুর মত চারদিকে ছোটাছুটি করল। নেই কোথাও নেই। সবিতা তুমি এত রাতে কোথায় গেলে? কোথায় গেলে প্রিয়তমা।

পশ্চিম দিক হতে একটা শব্দ ভেসে এল। ছুটল মিত্রদের পানা পুকুরের দিকে। এমন সময় সে অজানা পাখিটা ডেকে উঠল।

—ক্র···ক···ক···অ।

উৎপলের সে দিকে নজর নেই। তার জিজ্ঞাসু নেত্রের দৃষ্টি অনেক দূরে। পানা পুকুরের দিকে এল পুকুর পাড়ে। সামনে এক গলা জল কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। নারী মূর্তি। স···বি···ই···সবিতা।

অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠে নিজের নাম শুনে ফিরে দাড়াল নারীমূর্তি। কথা বলার ফুরসত নেই। মুহূর্তে ভয়ার্ত ও কান্নাভরা কণ্ঠে ঝাপিয়ে পড়ল উৎপল। সবিতা নিথর। নিশ্চল। মুখে কোন কথা নেই। চাঁদের আলোয় ছুজন ছুজনকে দেখল। উৎপল-সবিতার কান্না দিগন্তে ভেসে গেল। চোখের উষ্ণ জলে সমস্ত অভিমান, গ্লানি, ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল।

উৎপল সবিতাকে কোলে টেনে নিল এবং কাতর কণ্ঠে বলল।

—তোমাকে এখানে পৌছে দেবার মূলে আমি। সবিতা আমায় ক্ষমা কর। সাংসারিক ঝড়ের দোলায় এমনি অবস্থায় পৌছে গেছি যেখান থেকে তোমার সামনে আসতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আজ দেখছি মস্ত বড় ভুল করেছি।

—না গো না, আমার কি যোগ্যতা আছে তোমাকে ক্ষমা করার! তুমি আমায় ক্ষমা কর। তুমি আমার সমগ্র মন প্রাণ জুড়ে থেকেও অধৈর্য হয়ে তোমার উপর বিশ্বাস হারিয়েছি। এ কি সতীর পক্ষে কম অপরাধ!

—না সতী, যে চলে তারই ভুল হয়। কিন্তু শুধরে নেওয়া তারই কাজ। আমিও কত ভুল করেছি। হয়তো তোমার সামনে না থাকার জন্য পঙ্কিলে ডুবতে বসেছি। তাই বলে ক্ষণিকের ভুলের জন্য আমাদের সারা জীবন মরুময় হবে? তুমি আমার সব। আমায় শুধরে নাও।

—ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।

তবে এ পবিত্র মুহূর্তে বলতে পারি প্রবল জলস্রোতে সামান্য অনিষ্টকর কচুরাপানা জলজ প্রাণীদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

—হ্যাঁ প্রিয়তমা, তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু তা আবার গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। এক কলসি দুধে দুফোঁটা লেবু রস পড়লে সব দুধ নষ্ট হয়। যাইহোক আমাদের ভুল হলেও পদস্থলন হয়নি। ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।

—পরম করুণাময় আমাদের রক্ষা করেছেন। আমাদের চোখের জলে সব কালিমা ধুয়ে মুছে গেছে।

—সবিতা আমার মনে হচ্ছে তোমার স্বর্গীয় দাদু ও বাবা আমাদের আশীর্বাদ করেছেন। চল ঘরে ফিরি। আমাদের বন্ধন ছিন্ন করার শক্তি কারো নেই। তুমি আমার জীবন সঙ্গিনী। এ মন্ত্র আজ থেকে স্বার্থক হোক।

হ্যাঁ পাঠক উৎপল-সবিতা ঘরে ফিরছে। তাদের বরণ করার জন্য কেউ জেগে নেই। আসুন আমরা তাদের উলুধ্বনি এবং শঙ্খ বাজিয়ে বরণ করি।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—